মহামতি কটন্।

জনমি অ-সুর কুলে হে প্রভু কটন,
সুরভাবে হৃদিখানি রেখেছ ভরিয়া ;
দয়া, মায়া, স্নেহ আদি সুমহান গুণে
পূর্ণ তুমি ; তব বুদ্ধিমত্তা, নির্ভিকতা
আত্মা বলিদান, করেছে বিমুগ্ধ আজি
ভারতবাসীরে ; কত যে করেছ তুমি
তাহাদের তরে, বর্ণনে না যায় তাহা।
তব সম ধর্ম্মবীর বৃটনের কুলে
কেবা আছে আর, আদর্শ তাদের তুমি
ধর্ম্ম অবতার, ঈশ পাশে মাগি সদা
তোমার কল্যাণ ; বাঁচি রহ কিছুকাল
দীর্ঘায়ু লভিয়া ; সাধিয়া ভারত-হিত
জয়-মাল্য পরি, পরে করিও প্রয়াণ
হাসিতে হাসিতে প্রভু সে অনন্তধামে।
তোমার এ সৎপন্থা অনুগামী হয়ে
লভুক যশের ভাতি বিদেশী সকল।

সম্পাদক।

নমস্কার।

—*—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!
হে বন্ধু, দীনবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্ত্তি তুমি! তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান্
চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি! আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন,—
যার লাগি রুদ্র-দেব চিররাত্রিদিন
তপোমগ্ন; যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সঙ্কটযাত্রায়; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়;—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান—আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়,
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুবতারকার মত? জয়, তব জয়!
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব্ব মোর্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা! কোন্ অমানুষ

তোমার বেদনা হ'তে না পাইবে বল!
মোছ্ রে, দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল!

দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে,
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে! বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্ত্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি! শাস্তি তারি তরে,
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন;—যে নপুংস কোনো দিন
চাহিয়া ধর্ম্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার,—
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে, দুর্গতির করে অহঙ্কার;
দেশের দুর্দ্দশা ল'য়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ, মাতৃরক্ত প্রায়;
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তিভারে
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য-কারাগারে।

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি,

হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঝঙ্কার —
নাহি তাহে দুঃখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস! তাই শুনি অ জ
কোথা হ'তে ঝঞ্ঝাসাথে সিন্ধুর গর্জ্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্ত্তন
পাষাণপিঞ্জর টুটি,—বজ্রগর্জ্জরব
ভেরী-মন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গমাঝার,
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!

তার পরে তাঁরে নমি, যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হ'তে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক কান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি-অন্ধকারে।
যিনি নানা কণ্ঠে কন নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্ম্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে—"দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্ব ভয়;
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির!

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

আমাদের অবস্থা।

আজকাল কোন কোন মহাত্মার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—যে আমরা বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছি, পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধন হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকের উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিতে হইলে অন্য প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে একবার পল্লীগ্রামের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে বলি। কলিকাতা ও অন্যান্য সহরের অবস্থা যে অনেক উন্নত হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর নানাবিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে—তাহা অস্বীকার করা যায় না। অনেক স্থলেই বহু সুপ্রশস্ত রাজপথ, মূল্যবান হর্ম্ম্যাবলী, মনোহর উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। অসংখ্য বিপনী বহুদেশজাত পণ্য সম্ভার বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। সুনির্ম্মল পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বহু বিদ্যালয়, কার্য্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নানাদেশস্থ অসংখ্য নরনারী কার্য্যোপলক্ষে বাস করিয়া এই সকল সহরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র এই সকল আদর্শ সহরের অবস্থা সন্দর্শন করিয়া সমগ্র দেশের উন্নতি বিষয়ে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন নহে। সহর হইতে অধিক দূর যাইতে হইবে না—কেবলমাত্র ৫।৬ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া যদি আমরা কোন ভদ্রপল্লীতে প্রবেশ করিয়া তাহার ভূত এবং বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা জানিতে পারিব যে অধিক দিনের কথা নহে, ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় ১০ ঘর ব্রাহ্মণ, ১৫ ঘর কায়স্থ, ৩০ ঘর গোপ, ২ ঘর নাপিত, ৪ ঘর মোদক, ৮ ঘর তন্তুবায়, ৩ ঘর তৈলকার, ২ ঘর কর্ম্মকার, এবং চর্ম্মকার, ডুলে, হাড়ী, বাগ্দী প্রভৃতি ৫০।৬০ ঘর নিম্ন জাতীয় লোকের বাস ছিল। গ্রামের জনসংখ্যা ৫।৬ শত ছিল। কায়স্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে ৪।৫ ঘর বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন যাঁহাদের বাটীতে নিত্যসেবা দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়া অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। এক ঘর জমিদার ছিলেন যাঁহার কাছারি সদা সর্ব্বদা আমলা পাইক, দ্বারবান, প্রজাগণের দ্বারা জম্ জম্ করিত। কত সাধু, সন্ন্যাসী, অনাথ এবং অভ্যাগত সেবা পাইত। জনৈক ভট্টাচার্য্যের টোল ছিল—যথায় ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ

যাচ্যক্রিয়; দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর জমির আয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কায়স্থগণ সকর বা নিষ্কর জমির উপস্বত্বে কেহ কেহ বা স্থানীয় জমিদার সরকারে গোমস্তা নায়েব প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন। কাহাকেও উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া এদেশ ওদেশ করিতে হইত না। অভাব কিসের,—মরাই বা গোলা ভরা ধান, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খড়ের গাদা, গোয়াল ভরা গরু, বাগানের শাকসব্জি ক্ষেত্রের ডাল কড়াই, এবং পুষ্করিণী মৎস্যে পূর্ণ ছিল। যাহার কোন বিষয়ের অভাব থাকিত, প্রতিবেশীর আনুকূল্যেই তাহার মোচন হইত। অন্যান্য জাতীও স্ব স্ব ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। অভাবের তাড়না অনেকেরই অবোধগম্য ছিল। গ্রামে কয়েকটী স্বচ্ছ জলপূর্ণ প্রশস্ত জলাশয় ছিল গ্রাম্য দেবতাদিগের মন্দির ভিন্ন জমিদারের প্রতিষ্ঠিত শিবালয় ছিল। আজ সেই গ্রামে ১০।১২ ঘর বই ভদ্রলোকের বাস নাই। তাহার মধ্যে কোন বাটীতে ২। টী বিধবা এবং অবগণ্ড বালকবালিকা—পুরুষ নাই, মারা পড়িয়াছে। কোন বাটী চাবি বন্ধ—গৃহস্বামীর আর গৃহে বসিয়া খাইবার সংস্থান নাই, সুতরাং চাকরি করিবার জন্য দেশান্তর গমন করিয়াছেন। কোন বাটীতে ২।১টী ম্যালেরিয়ায় জীর্ণশীর্ণ নরনারী আছেন—পুরুষেরা বিদেশে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার সামর্থ্য নাই, অগত্যা অনশন ও ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত হইয়া পৈত্রিক ভিটায় সন্ধ্যা দিতেছেন। কোন বাটীতে স্ত্রীলোক এবং বালিকারা থাকেন—পুরুষেরা অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য বিদেশে গিয়াছেন। চাকরিজীবির মধ্যে কেহ শনিবারে ও ছুটিতে বাড়ী আসেন। অন্যান্য দিন গ্রামে ভদ্রলোক বড় একটা দেখা যায় না। কেবল রবিবারে ও ছুটিতে কয়েকজনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চৌলের কোন চিহ্ন নাই। ঐ ভাঙ্গা দেওয়াল তাহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহার পুত্র বা পৌত্র কোন মুদির দোকানে খাতা লেখেন। জমিদারের ঐ প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে। অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। তথায় দিবাযোগে শৃগাল প্রভৃতি জন্তুগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে—ভয় কাহাকে, কেই বা বাধা দেয়। শিবমন্দির ভগ্ন, ভগ্নস্থ শিবলিঙ্গ উপবাসী। জমিদার সেবার কোন বন্দোবস্ত করেন নাই—তাঁহার জমিদারী বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শিবের সেবা বন্ধ

হইয়াছে। অনেক ভদ্রলোকের সাবেক জমিজমা হস্তচ্যুত হইয়াছে। জমিদার নির্ব্বংশ নহেন, তাঁহার ২।৩টী পুত্র আছেন। কেহ হাকিমি, কেহ উকালতি প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহারা যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতে তাঁহাদের উচ্চ চালচলনের ব্যয়ই সঙ্কুলান হয় না—ধর্ম্মকর্ম্ম ত দূরের কথা এবং দেশ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া কেহ বাস্তভিটায় কখন পদার্পণ করেন না।

সকল বাটীতে ধান্যের গোলা দেখা যায় না। অনেকেই চাউল খরিদ করিয়া থাকেন। ধনবান গৃহস্থের পূজাদি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অট্টালিকার ইষ্টক সকল খসিয়া পড়িতেছে ঐ তাঁতির তাঁতশালা—যাহার ঠক্‌ঠকানিতে এক সময়ে কাণ পাতা দায় হইত—বহু নরনারী অষ্টপ্রহর কার্য্য করিত কেহ সুতা তুলিতেছে—কেহ টানা দিতেছে, কেহ বুনিতেছে ইত্যাদি, যথায় সুচিক্কণ বহুমূল্য বস্ত্র সকল প্রস্তুত হইয়া দেশের লোকের লজ্জা নিবারণ করিত এবং বহু দেশে রপ্তানি হইত তাহা আজ বন্ধ। দেশী কাপড় খরিদ করে কে, সস্তার বিলাতি কাপড়ে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। কাজেই তাহাকে মাকু ছাড়িয়া লাঙ্গলের আশ্রয় লইতে হইয়াছে, নচেৎ ভিক্ষা বা দাসত্ব করিবার জন্য দেশত্যাগী হইতে হইয়াছে। ঐ মদকের দোকান, যথায় এক সময়ে বহু কারিগর দিবারাত্র ভিয়ান করিয়া, নানাবিধ সুখাদ্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া রাখিত, যেখানে পর্ব্বত প্রমাণ গুড়ের শূন্য জালা, পাই প্রভৃতি পড়িয়া থাকিত, যে ঘরে চিনি, দোলোতে তিলমাত্র স্থান থাকিত না, তাহা আজ অন্ধকার, চালে খড় নাই, দেওয়ালের মাটী খসিয়া পড়িতেছে, কয়েকটী ভাঙ্গা হাঁড়িতে মুড়ী মুড়্‌কী, বাতাসা এবং নারিকেল সন্দেশ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশ মিষ্টান্ন বিলাতি চিনিতে প্রস্তুত। বিলাতি চিনির আমদানীতে তাহার চিনির কারবার উঠিয়া গিয়াছে, কারণ বিলাতি চিনির মণ ৭ টাকা কিন্তু দেশী চিনি ১০ টাকায়ও পড়তা পড়ে না। গ্রামে খরিদ্দারের সংখ্যাও হ্রাস হওয়ায়, অন্যান্য দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয় না। তাই তাহার দিন চলা ভার। কর্ম্মকারের দোকান এখনও বন্ধ হয় নাই, কারণ বঁটী, কাটারী, কুড়ুল, কাস্তে, লাঙ্গল প্রভৃতি দ্রব্য এখনও বিদেশ হইতে আমদানী হয় নাই, নচেৎ ছুরি, কাঁচি, খুর, কব্জা, পেরেক, চাবিতালা প্রভৃতি লাভজনক দ্রব্য সমস্তই বিদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। বেচারা

পূর্ব্বপুরুষের পুণ্য ভিটায় বসিয়া আজ দুমুটা অন্ন পাইতেছে। তৈলকার-দিগের ঘানির ক্যাঁ ক্যোঁ শব্দে পূর্ব্বে অস্থির করিয়া তুলিত, আজ কাহারও গাছ একবারে বন্ধ, কোনটী মধ্যে মধ্যে চলে। তৈলের সের ॥৵০, অত মূল্য দিয়া কয়জনে তৈল খরিদ করিতে পারে। যাহার ৩ সের তৈল লাগিত, এখন তাহাকে ২ সেরে সারিতে হইতেছে। আর সরিষা অত্যন্ত মহার্ঘ হওয়ায়, তাহাদিগের বড় লাভ থাকে না এবং কলের তৈল সুলভ মূল্যে বিক্রীত হওয়ায় ঘানির তৈলের কাটতি কমিয়া গিয়াছে। তাই কেহ সহরে চাকরি করিতে গিয়াছে, কেহ বহুকষ্ট সহ্য করিয়া এখনও দোকানের ঠাট বজায় রাখিয়াছে। চর্ম্মকারের ব্যবসা ভাল চলে না। বিদেশ হইতে সু, বুট, স্লিপার প্রভৃতি মনোহর পাদুকা সকল আমদানী হইতেছে। সৌখিন সম্প্রদায় তাহাদের লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। মুচির জুতা ছোঁয় কে। কাঁচা চামড়া বেচিয়া এবং গরিবের চটি জুতা তৈয়ার করিয়া তাহার দিনপাত হয়।

যাহারা স্বহস্তে চাষ করে, তাহারা কোনক্রমে উদরবৃত্তি নিবৃত্তি করি-তেছে। শ্রমজীবিদিগের কষ্টের সীমা নাই। সমস্ত খাদ্য দ্রব্য এখন দ্বিগুণ দরে সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তাহাদিগের পারিশ্রমিকের হার কিছু বৃদ্ধি হইলেও অত বৃদ্ধি হয় নাই এবং অত অধিক হারে প্রচুর পরিমাণে কার্য্য মিলে না। গ্রামের পুষ্করিণী সকল মজিয়া আসিতেছে, পানা প্রভৃতিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সংস্কার করে কে—কাহার অবস্থা ভাল, অগত্যা ঐ দুষণীয় জল পান করিতে হইতেছে। এই কারণে এবং পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে ঘাস, বৃক্ষচ্যুত পত্র, জঙ্গল প্রভৃতি পচিয়া যে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারির উৎপত্তি হয়, তাহার প্রচণ্ড অনলশিখায় অসংখ্য নরনারী পতঙ্গের ন্যায় দলে দলে ভস্মীভূত হইয়া, বহুজনপূর্ণ লোকালয় মহাশ্মশানে পরিণত হইতেছে। ঐ ভাঙ্গা দেওয়াল সকল, স্তূপাকৃতি ইষ্টকরাশি তাহার জলন্ত নিদর্শন। তাই আজ গ্রামে ৭০।৮০ জনের অধিক লোকের বাস নাই। গ্রাম্য বারোয়ারি বন্ধ (অবশ্য আমরা বারোয়ারির পক্ষপাতী নহে)। লোকের পেটের ভাতই জোটে না সক ত কোন ছার। তা ছাড়া গ্রামে একতা নাই। যে বারোয়ারি তলায় অষ্টপ্রহর মজলিস হইত, যথায় মান-নীয় প্রবীন ব্যক্তিগণ পরস্পরের বিষয় কর্ম্মের সুখ দুঃখের আলোচনা

ঝগড়া, গণ্ডগোল করিতেন, বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করিতেন, অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেন—তখন সমাজ বন্ধন এত শিথিল হয় নাই—সকলেই অগ্রনীগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিত, আজ তাহা অন্ধকার। এখন আইনের কল্যাণে সকলেই সমান, সকলেই প্রধান, কেহ কাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। শশা চুরি, শাক চুরি হইলে মোকদ্দমা রুজু হয়। ১০ টাকা মূল্যের সম্পত্তির জন্য ৫০০৲ টাকা মোকদ্দমা খরচ হয়। মোকদ্দমার পর মোকদ্দমা চলিতে থাকে। ফলে এইরূপে শোণিতসম অর্থ, আইনের আদ্যশ্রাদ্ধে ব্যয়িত হইয়া লোকে দিন দিন অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

আমরা কোন পল্লী বিষয়ের কথা লিখি নাই। প্রায় সকল গ্রামরে এই অবস্থা। তবে অনেকস্থলে চাকরিজীবির বেতনের হার বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ বৃদ্ধি তাহাদের আর্থিক উন্নতির পরিচায়ক নহে। কারণ "যত্র আয় তত্র ব্যয়" হইতেছে, কাহারও কাহারও কুলান হয় নাই। যদি ১০ টাকা আয় হইয়া ৬ টাকা খরচ হয়, তবে ৪ টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে যদি ৫০৲ টাকা আয় হইয়া ৫৫৲ টাকা ব্যয় হয়, তবে ৫ টাকার অসংস্থান থাকে। অধিকাংশস্থলে এইরূপ উন্নতিই পরিলক্ষিত হয়। পিতা ১০ টাকা বেতনে চাকরি করিয়া, দোল দুর্গোৎসব করিয়া বহু ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আর পুত্র ৫০০৲ টাকায় ডেপুটীগিরি করিয়া মৃত্যুকালে ৫০০০৲ টাকার ঋণ রাখিয়া গেলেন। আজকাল পল্লী গ্রামে, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দেবালয়, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা হইতে বড় একটা দেখা যায় না, বরং পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার লোপ পাইতেছে। এই সকল কি আর্থিক উন্নতি এবং সুখ-সচ্ছন্দতার লক্ষণ? কয়েকজন ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী বা উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী দেখিয়া বা কোন বিবরণীতে প্রকাশিত অঙ্ক যশের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। অঙ্কযশ সকল সময় সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। (Figures are not always fact.)

শ্রীনগেন্দ্র নাথ পাল।

কেন তেয়াগিব ?

১

কামনা মমতা তুমি দেছ,
আমি তাহা কেন তেয়াগিব ?—
তব স্নেহ-উপহার বলি,
সযতনে হৃদয়ে রাখিব।

২

প্রেমময় ! কর আশীর্ব্বাদ,
সন্তাপ-নিদাঘ তপ্ত যারা,
তারা যেন শান্ত হয় লভি'
মোর স্নিগ্ধ মমতার ধারা।

৩

দীন-দুঃখী পাপী পুণ্যবান,
সব মম হোক্ আপনার।
নিখিল বিশ্বের হিত সদা
মাগি যেন চরণে তোমার।

৪

করুণা-নিলয়। দীনা দাসী
রাতুল চরণে তব যাচে ;
সাধুতার নামে নির্ম্মমতা
কভু যেন নাহি আসে কাছে।

৫

চাহি না গো নিষ্কাম হইতে,
চাহি না গো সন্ন্যাস কঠোর ;—
কামনা মমতা চিরদিন
বেঁচে থাক এ হৃদয়ে মোর।

শ্রীমতী প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি রচয়িত্রী।

প্রেমের উচ্ছ্বাস।

—*—

এত প্রেম, এত প্রেম, এ ক্ষুদ্র হিয়ায়
রুদ্ধ করি নিশিদিন বারি-বিন্দু প্রায়
রাখিতে পারিনে আর ! প্লাবি ভূমণ্ডল,
প্লাবি বিশ্ব, মানবের হৃদয় অতল
উদ্বেলিয়া উচ্ছ্বাসিয়া তরঙ্গিয়া সুখে
ছুটে যেতে চায় দ্রুত মহাসিন্ধুমুখে
বিঘ্নহীন বাধা-হীন ! সৌন্দর্য্য যথায়
মহান্ গাম্ভীর্য্য সাথে নিয়ত খেলায়
অশ্রান্ত-সঙ্গীত মাঝে, সসীমে অসীমে
আলিঙ্গনে বদ্ধ যথা অফুরন্ত প্রেমে
নিঃশব্দে কল্পনাতীত কোটি কল্প ধরি—
জন্ম-জন্মান্তের প্রেম মরি, মরি, মরি,
আত্ম-বিসর্জ্জন সেথা দিতে চাহে আজ—
কোথা সিন্ধু,কোথা প্রিয়,কোথা প্রেম-রাজ !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

বড়দিনের ছুটি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বিহঙ্গমকুলের সুমধুর কলতানে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম। তখন পূর্ব্বদিক নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া তরুণ প্রভায় সূর্য্যদেব উদিত

হইতেছেন। প্রভাত-কিরণ-স্পর্শে তরুশিরে শিশিরকণা এক অপরূপ শোভা ধরিয়াছে। বিহঙ্গমগণ ধরণীকে সজাগ করিবার জন্য যেন প্রভাতী সঙ্গীত ধরিয়াছে। পল্লীগ্রামের সে নয়ন-মনোমুগ্ধকর অপরূপ শোভা দেখিয়া শৈশবের কত মধুর স্মৃতি অবগুণ্ঠনাবৃতা নববধূর ন্যায় ধীরে ধীরে মনশ্চক্ষে প্রতিফলিত হইল। এমনি প্রভাতে সঙ্গীগণ সহ কতদিন 'আয় রোদ্দুর হেলে' বলিয়া নবীন রবির অভ্যর্থনা করিয়াছি, কতদিন 'ক চোক বাঁধিয়া 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' খেলিয়াছি, সে দিন আর নাই, সে সাহস নাই, সে উৎসাহ নাই, আজ কেবল অতীতের সেই মধুর স্মৃতি।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া কিছু জলযোগের আয়োজন করিতে ৮ টা বাজিয়া গেল। একজন লোককে গাইড্‌রূপে সঙ্গে লইয়া আমরা জঙ্গল ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। লোকালয় ছাড়িয়া জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোথাও পার্ব্বতীয় নদীতে মেষ সকল জল পান করিতেছে, কোথাও মহুয়া বৃক্ষতলে রাখাল মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিত হইয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিয়াছে, অদূরে গোবৎসগণ মনের আনন্দে চরিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও রাখাল বালক তিতির পক্ষী ধরিবার আশে ফাঁদ পাতিয়া লতাগুল্মান্তরালে চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে, কোথাও কাঠুরিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠ কাটিতেছে ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে আমরা চলিয়াছি। ৪।৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিলাম, কিন্তু প্রকৃত জঙ্গল দেখিতে পাইলাম না। আমাদের গাইড্‌টী যে পথ চিনে, না তাহার পরিচয় পাইতে বড় বিলম্ব হইল না। হতাশ হইয়া এক মহুয়া বৃক্ষতলে বসিয়া ধূমপানের চেষ্টা দেখিতেছি, অদূরে একটী লোককে দেখিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলাম। সে ব্যক্তি যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া সকল আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এখনও ৫।৬ মাইল যাইতে হইবে, আমরা পথ ভুলিয়া অন্যদিকে আসিয়াছি। ইচ্ছা হইল গাইড্‌টীকে কিছু শিক্ষা দিই। যে বেচারি আমাদিগকে পথ বলিয়া দিল, সে জাতিতে কোল, নাম জথু কি মথু, এইরূপ একটা কি ঠিক স্মরণ নাই। লোকটা শ্বশুরালয় হইতে স্বীয় গৃহিণীকে আনিবার জন্য যাইতেছে। এই স্থানে লোকটীর পোষাক সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করি। হাতে ৬ ফুট লম্বা বিশাল বংশদণ্ড, মাথায় ১৭ গজি ধানের পাকড়ি, তাহার এক প্রান্তে কিছু ছোলা ভাজা বাঁধা আছে, পরিধানে মসিনিন্দিত মলিন "মুটিয়া" মালকোঁচা মারা

দেহের রঙের সহিত মিলাইয়া আছে; মস্তকের বিপুল পাকুড়ি হিমাদ্রির শিরে তুষারখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সে মূর্ত্তি দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই।

ক্ষুধায় পেটে দাবানল জ্বলিতেছিল—আর বৃথা ঘুরিয়া আহাতে ঘৃতাহুতি দেওয়া কষ্টকর ভাবিয়া তাঁবুতে ফিরিতে বাধ্য হইলাম। এক প্রাচীন বটবৃক্ষতলে ২টী বালক ছাগশিশু রক্ষা করিতেছে দেখিলাম। বৃক্ষটীর চারিধার ঘন কণ্টক দ্বারা ঘেরিয়া মধ্যে ছাগশিশুদিগকে বন্য হিংস্রজন্তুদিগের আক্রমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য গড় প্রস্তুত করা হইয়াছে। বালকদ্বয় দূর হইতে কোটপ্যাণ্টধারী আমাদিগকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া আমাদিগকে ছাগাখেষী শিকারী মনে করিয়া 'বাবু হামার বাছিয়া মত লেও" বলিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমরা শিকারী নই এবং তাহাদের ছাগশিশুও লইতে আসি নাই শুনিয়া, নিরস্ত হইল। বালক-২টী পয়সা দেওয়া হইলে, তাহারা বড়ও খুসী হইল। সাহ্লাদে সেলাম করিয়া বলিল "হাম পচে ইঁহা রহিত", আমরা এইস্থানে থাকি। পরিচয়ে জানিলাম, তাহাদের পিতামাতা জঙ্গলে গিয়াছে, বালকদ্বয় শাবকগুলিকে রক্ষা করিতেছে। যে সকল সাহেব এখানে শিকারে আসেন, তাঁহারা প্রায়ই ॥০ আট আনা মূল্য দিয়া ইহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ছাগ লইয়া থাকেন। মহিষ শাবক লইলে ৩৲ টাকা দেওয়া হয়। ইহাই "নিরিখ"। এই সকল ছাগ ও মহিষ জঙ্গলে বাঁধিয়া রাখা হয়; ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক তাহারা নিহত হইলে শিকারী বোঝেন যে, শিকার নিকটেই আছে। তখন 'হাঁকওয়া" করা হয়। পঞ্চাশ বা তদধিক 'জঙ্গলী আদ্‌মী" লাঠি দ্বারা জঙ্গল পিটিয়া জঙ্গলের শান্তিভঙ্গ করিয়া বন্যজন্তুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। বন্যজন্তুগণ প্রাণের ভয়ে ইতস্তত: দৌড়িতে আরম্ভ করে; সেই সময়ে শিকারী মাচানের উপর হইতে তাহাদের উপর গুলি চালান। এই হাঁকওয়া দেখিতে হইলে শিকারীর সঙ্গে যাইতে হয়। অসংখ্য ময়ূর কাক চিলের ন্যায় উড়িয়া পলাইতেছে, কত হরিণ, ভালুক নীলগাই তীরবেগে প্রাণভয়ে দৌড়াইতেছে—অমনি তাহাদের উপর শত শত লাঠি পড়িতেছে, সেদিকে দৃক্‌পাত নাই। হরিণ সকল কখনও দলছাড়া হয় না; যেদিকে দলের একটী হরিণ যাইবে, দলশুদ্ধ সেইদিকে ধাবিত হইবে। দলের অগ্রে ও পশ্চাতে দুইটী সর্দ্দার হরিণ থাকে, মধ্যে হরিণী ও শাবকগুলি থাকে।

সাহেবরা হরিণীর প্রতি লক্ষ করেন না। বাছিয়া বাছিয়া হরিণ মারাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। হরিণী দৈবযোগে মারা পড়িলে, সাহেব-সমাজে লজ্জার কথা।

পথিমধ্যে মূর্ত্তি গ্রামের জমিদার বাবুর বাসায় উপনীত হইলাম। জমিদার বাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বড়ই সদালাপী। বিদেশী শিকারী দেখিলে সাদরে তাঁহার গৃহে আশ্রয় দিয়া থাকেন। সাহেবরা শিকারে আসিলে প্রায়ই ইঁহাকেই শিকারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হয়। একবার মিলিটারি বিভাগের কোন কর্ম্মচারী শিকারে আসিয়া ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং যাইবার সময় নিজের দোনলা বন্দুকটী দান করিয়া যান। মির্জাপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এ সংবাদ পাইয়া জমিদার বাবুকে বন্দুক সহ তলপ করেন এবং বন্দুকটী নিজে হস্তগত করেন। শুনা যায়, হুজুরের রাজ্য মধ্যে কালা আদমির শিকার করিবার হুকুম নাই। এক সময়ে নাকি হুজুরের এক বাঙ্গালী কেরাণী একটী ব্যাঘ্রশাবক ক্রয় করিয়াছিলেন। হুজুরের কাণে এ সংবাদ পৌঁছিবামাত্র হুজুর স্বশরীরে বাবুর নিকট উপস্থিত হয়েন এবং অনতিবিলম্বে ব্যাঘ্রশাবককে জঙ্গলে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন। শাবক বড় হইলে তিনি নিজে শিকার করিবেন। এই গৌরাঙ্গ পুঙ্গবের শিকার প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল যে, নিজ প্রভুত্ব মধ্যে সহজে কাহাকেও বন্দুকের পাশ দিতে চান না, পাছে কেহ তাঁহার শিকার মারিয়া ফেলে।

বেলা প্রায় ৪ টার সময় তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। আহারাদি প্রস্তুতই ছিল, আহারান্তে এক্কা করিয়া মির্জাপুর রওনা হইলাম। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে অস্তাচলাভিমুখে চলিয়াছেন, পল্লীবাসিনী রমণীরা গাগরী কক্ষে লইয়া মরালগমনে জলাশয়ে চলিয়াছে। বালক বালিকা রাস্তার উপর খেলা করিতেছে। আমাদের এক্কা দেখিয়া 'বাঙ্গালী বাবু সেলাম, 'বাঙ্গালী বাবু সেলাম' বলিতে বলিতে এক্কার সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল। এই সকল বলিষ্ঠ বালক দেখিয়া, বাঙ্গলার ম্যালেরিয়া-পীড়িত, ক্ষীণকায়, স্ফূর্ত্তিহীন বাঙ্গালী শিশুর কথা মনে পড়িল। হায় বাঙ্গালি! কি পাপে তোমার এ দশা হইল? চিরকালই কি তুমি এরূপ দুর্ব্বল, উৎসাহহীন, নির্জ্জীব ছিলে? একবার মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কথা স্মরণ কর, চাঁদরায় ও তৎপুত্র কেদার রায়ের কথা স্মরণ কর, সীতারাম ও রামচন্দ্র খাঁর কথা স্মরণ কর, আর কত বলিব, পলাশীর যুদ্ধের মহাবীর মোহন পালের কথা

স্মরণ কর। হায় বাঙ্গালী এতদিন কি মোহাবেশে নিদ্রিত ছিলে, যদি জাগিয়াছ, দীনা হীনা মাতৃভূমির করুণ ক্রন্দন যদি কাণে পৌঁছিয়াছে, তবে আর ঘুমাইও না। একবার হিংসা, দ্বেষ ভুলিয়া মায়ের কাজে জীবন উৎসর্গ কর, তবেই বঙ্গের দুঃখনিশি অবসান হইবে, বাঙ্গালা আবার সোণার বাঙ্গলা নামে অভিহিত হইবে। বল ভাই, একবার সপ্তকোটি কণ্ঠে বল "বন্দে মাতরম্।"

শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চামড়ার পালিশ।

(চামড়ার কালি, পালিশ ও জলাভেদ্যকরণ প্রণালী)

চামড়ায় পালিশ লাগাইলে উহা নরম, নমনীয় এবং অল্প ঘর্ষণেই উজ্জ্বল হয়। ইহার প্রণালী জুতার কালি প্রস্তুত প্রণালী হইতে বিভিন্ন।

রং করিবার নিমিত্ত হাড়ের কয়লা, কাঠের কয়লা ও কজ্জল বা ভুষা (Lamp black) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু হাড়ের কয়লা প্রথমে পরিষ্কার করিয়া লইলে উহার রং সর্ব্বাপেক্ষা ঘোর উজ্জ্বল এবং স্থায়ী হয়।

হাড়ের কয়লা পরিষ্কার করিবার প্রণালী ঃ—প্রথমে ২০ ভাগ হাড়ের কয়লার সহিত ৬ ভাগ পরিষ্কার লবণ-দ্রাবক (হাইড্রোক্লোরিক এসিড) একত্রে ২৪ ঘণ্টা রাখিতে হইবে; তাহার পর ১০০ ভাগ ফুটন্ত জল উহাতে মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন পরে থিতিয়া পড়িলে, তরল ভাগ ঢালিয়া ফেলিবে এবং নীচে যে থিতুনি বা পলি পড়িবে তাহাতে ৫ ভাগ তীব্র গন্ধক-দ্রাবক (সলফিউরিক এসিড) মিলাইয়া পুনরায় ২৪ ঘণ্টা রাখিবে। তাহার পর আবার ১০০ ভাগ ফুটন্ত জল মিলাইয়া জলীয় অংশ পৃথক করিলে অবশিষ্ট পলি পরিষ্কার এবং অম্লতাহীন হইবে।

চর্ম্মের সহিত সংলগ্ন করিবার জন্য উহার সহিত কোন চট্‌চটে দ্রব্য মিলান আবশ্যক; সেই জন্য ২ ভাগ গুড় এবং এক ভাগ মিসারিণ ব্যবহার করা

যাইতে পারে। কিম্বা এরূপ কোন দ্রব্য দেওয়া যায় যাহা শুকাইয়া যায় না। যথা—জলপাই, তিল, তিসি বা কড্ তৈল এবং চর্ব্বি ইত্যাদি। ডিমের শুভ্রাংশ, মৎস্য সিরিষ (Isinglass) এবং ময়দা ব্যবহৃত হইলে চামড়ায় ছাতা পড়ে এবং ফাটিয়া যায়। ধুনা বিশিষ্ট তৈলও ব্যবহার করা উচিত নহে ; ধুনা বিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা পালিশ তৈয়ার করিলে চামড়া জলাভেদ্য হয় ; কিন্তু ঐ সকল পদার্থ শুকাইলে শক্ত হয় এবং চামড়া ফাটিয়া যায়। সেইজন্য উহার সহিত গ্লিসারিণ (glycerine) মিশ্রিত করিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গ্লিসারিণ (glycerine) দ্বারা চামড়া নরম থাকে।

* * * * * *

নিম্নে কয়েকটী বিভিন্ন প্রণালী লিখিত হইল ঃ—

১ম। পালিশ ঃ—প্রথমে একটী পাত্রে ৪ আউন্স টুকরা সিরিষের সহিত ১ পাইন্ট সির্কা (venegar) মিলাইয়া কিছুক্ষণ রাখিলে উহা গলিয়া নরম হইয়া যাইবে। অন্য একটী পাত্রে আধ পাইন্ট ইংরাজী কাল কালিতে ২ আউন্স গঁদ ভিজাইতে হইবে। এক্ষণে প্রথম পাত্রটীর সিরিষের সহিত অল্প উত্তাপে আবার আধ পাইন্ট সির্কা মিলাইয়া যখন উহা সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যাইবে তখন দ্বিতীয় পাত্রটীর গঁদ ও কালী উহাতে ঢালিয়া দিবে এবং উত্তাপ ১৮০ ডিগ্রী রাখিয়া সামান্য জলের সহিত ২ ড্রাম মৎস্য সিরিষ উহার সঙ্গে মিলাইতে হইবে। তাহার পর উত্তাপ বন্ধ করিয়া শীতল হইলে কার্য্যোপযোগী হইবে।

স্পঞ্জের দ্বারা অল্প পরিমাণে চামড়ায় লাগাইতে হয়। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া তারপর ঘসিলে চামড়া উজ্জ্বল হইবে।

২য় কালি ঃ—২ আউন্স মেষ চর্ব্বি এবং ৬আউন্স নরম মোম একত্রে গলাইয়া উহাতে ৬ আউন্স নরম সাবান, ২½ আউন্স ভূষা ও ½ আউন্স নীলের গুঁড়া উত্তমরূপে মিলাইতে হইবে। শেষে ½ পাইন্ট টার্পিন তৈল মিলাইতে হইবে।

৩য় কালি ঃ—(ক) ১ পাউণ্ড মোম, ৪ আউন্স হাড়ের কয়লা, ১ আউন্স প্রসিয়ান নীল একত্রে, ২ আউন্স তিসি তৈল, ৩ আউন্স টার্পিন তৈল ও ১ আউন্স কোপ্যাল বার্ণিশের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মিলাইতে হইবে ; এইগুলি সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক এবং গরম থাকিতে থাকিতে পিষ্টক করিয়া রাখা উচিত।

(খ) গরম থাকিতে থাকিতে উহার সঙ্গে ৪ আউন্স নরম সাবান এবং ৬ আউন্স টার্পিন তৈল মিলাইলে ভাল হয়।

৪র্থ—জলাভেদ্য কালি :—একটী মসৃণ পাত্রে ২ আউন্স কাল ধূনা অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া উহাতে ৩ আউন্স মোম মিলাইতে হইবে। ইহা যখন গলিয়া ধূনার সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন উত্তাপ বন্ধ রাখিয়া উহার সহিত ½ আউন্স ভাল কজ্জল ও ½ ড্রাম প্রসিয়ান নীলের গুঁড়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিলাইতে হইবে। শেষে উহাতে টার্পিন তৈল এরূপ পরিমাণে মিলিত করিতে হইবে, যাহাতে উহা পাতলা কাই অবস্থায় পরিণত হয়।

ইহা একটী স্পঞ্জের দ্বারা চামড়ায় লাগাইয়া শেষে নরম তুলি বা ব্রসের দ্বারা ঘসিলে চামড়া উজ্জ্বল ও জলাভেদ্য হইয়া থাকে।

৫ম কালি :—

মৎস্য সিরিষ	½ আউন্স
উত্তম গুঁড়া নীল	½ আঃ
নরম সাবান	৪ আঃ
সিরিষ	৫ আঃ
লগ উড্ (Log wood)	৪ আঃ
সির্কা	২ পাইন্ট
হাড় কয়লার গুঁড়া	½ আঃ
মোম	১ আঃ

প্রথমে লগ উডের সহিত সির্কা মিলাইয়া অল্প উত্তাপ দিলেই ঐ সির্কা লাল হইয়া যাইবে; তার পর উহা ছাঁকিয়া সির্কার সঙ্গে অন্য অন্য উপকরণ মিলাইলে উত্তমরূপ মিশ্রিত হইয়া যাইবে। শেষে প্রস্তর কিম্বা কাচের শিশিতে রাখিতে হইবে।

(স্বদেশী হইতে উদ্ধৃত)

শারদীয়া পূজা।

(আমার পরম শ্রদ্ধাভাগিনী ভগিনিতুল্যা মধ্যপাড়া নিবাসিনী শ্রীমতী সরোজিনী সেন গুপ্তার লিখিত কতকগুলি কবিতা ঘটনাক্রমে আমার হস্তগত হয়। লেখিকা জীবনের প্রথম বয়সেই স্বামীপুত্রধনে বঞ্চিতা হইয়া হৃদয়ে দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিতেছেন। এই সব সাংঘাতিক দুর্ঘটনা পরম্পরাই তাঁহার হৃদয়ে কবিতার উৎস সৃষ্টি করিয়াছে। মনে হয় হৃদয়ের রুদ্ধ শোকাবেগ শেষে কবিতার ধারায় নিঃসৃত হইয়াছে। লেখিকা হিন্দুকুলকন্যা ও হিন্দুকুলবধূ। সাধারণ গৃহশিক্ষা ব্যতীত আর বিশেষ কোন শিক্ষা প্রাপ্তির অবসর তাঁহার ঘটে নাই ; সুতরাং তাঁহার এ প্রযত্ন দুঃখাঘাত সম্ভূত হইলেও সহানুভূতি ও উৎসাহের যোগ্য বিবেচনায় তাঁহার অনুমতি লইয়া আমি ইহা পাঠকপাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। লেখিকার নিকট এ অনুমতি লইতে আমায় বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। অদ্য একটী কবিতা প্রকাশিত করিলাম। মধ্যে মধ্যে আরও প্রকাশের ইচ্ছা থাকিল। জানি না, পাঠকপাঠিকাগণ ইহা কিভাবে গ্রহণ করিবেন। আমার এ বিষাদগাথার করুণ সুর বড়ই সরল ও প্রাণস্পর্শী বোধ হইয়াছে। অলমতি বিস্তরেণ। শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।)

আসিল শারদী পূজা, মানবের সাজাগুজা,
ধনী, দীন সকলের আমোদের দিন ;
নানা মত দ্রব্য যত, দোকানী সাজায় কত,
নানাজাতি ফল ফুলে সাজিছে বিপিন।
আকাশেতে মেঘ নাই হরষে চন্দ্রমা তাই
তারকা বেষ্টিত হ'য়ে হাসে খল খল ;
যে ভাবে যে আছে যথা, বাড়ী যাব এই কথা,
মনেতে ভাবিয়া সবে কিনিছে সকল।
আহা কি সুখের দিন ভাবিতেছে ধনী দীন,
কিনিব কাহার তরে, কার কিবা আছে ;
বাসনা হইবামাত্র, লিখিতেছে চিঠি পত্র,
মাতা, ভাই, জায়া, পুত্র ভগিনীর কাছে।

কে কোথায় নিরানন্দ, কলেজ কাছারি বন্ধ,
হবামাত্র যায় বাড়ী আনন্দ অপার ;
সুখ দুঃখ বক্ষে ধরি সবাই আসিছে বাড়ী
আসিতে পারেনি ভাই শারদা আমার।
মায় পত্র লিখে ভাই, রাখিয়াছে কোন ঠাঁই,
কোথা বা বোতল শিশি পরিষ্কার করি ;
সদা ফুল্ল-প্রাণে ভাই, অভাব কি ভাবে নাই,
কেবল সাহস বুকে রাখিয়াছে ভরি।
দাদার সন্তান হবে, অতুল আনন্দে সবে,
ভাবিয়াছ এতদিনে পূর্ণ-মনস্কাম ;
হায়রে আনন্দ মনে, এমন সুখের দিনে,
কেনরে দারুণ বিধি হ'ল তাতে বাম।
আসিতে পারেনি ভাই, তার কিছু মনে নাই,
কেবল মায়ের বুকে মারিয়াছে বাণ ;
হায় বুক ফেটে যায়. ভুলিতে পারে না মায়,
ভীষণ অনলে জ্বলে মায়ের পরাণ।
এ সময়ে যদি কেউ, পুত্রেতে বঞ্চিত হও,
এস মোর মার কাছে করিতে ক্রন্দন ;
ভাবিতে ফাটে গো বুক, হায় কি দারুণ শোক,
যে জানে সে বিনে অন্যে বোঝে না কখন ॥
জগন্মাতা আগমনে, সবাই প্রসন্ন মনে,
প্রিয়জন-সঙ্গ-আশে প্রফুল্ল-হৃদয় ;
পুত্রহারা জননীর, পতিহীনা দুঃখিনীর,
অভাগা হৃদয় শুধু করে হায় হায়।
মাগো দেবি জগদ্ধাত্রী, জগত মঙ্গল-দাত্রী,
আসিলে তো তুমি মাগো এ বঙ্গে আবার ;
মোদের হৃদয়ধন, কোথা হন অদর্শন,
সে কই মা তোর সনে ফিরিল না আর !
সুখ দুঃখ এ ধরায়, ঘটে মা তোরি ইচ্ছায়,
অবোধ বুঝি না মোরা ব্যথা পেয়ে কাঁদি ;

করু মা যা ইচ্ছা হয়, সকলই মঙ্গলময়,
তাই ভাবি ও চরণে প্রাণ যেন বাঁধি।

শ্রীমতী সরোজিনী সেন গুপ্তা।

মহাশক্তি আবাহন।

আবার কালচক্রনেমির আবর্ত্তনে বর্ষাপগমে শরৎ আসিয়াছে। আবিল সলিলনির্ম্মুক্তামহী আবার বিচ্ছশৎ কাশ চামরা শস্যসম্পদ্-শ্যামলা, কুমুদ-কহ্লারারবিন্দ সেফালিমালা শোভিতা হইয়া হাসিয়াছে; মেঘ নির্ম্মুক্ত নীল নভোমণ্ডল আবার শারদীয় জ্যোৎস্নার বিমল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া স্বীয় নালিমা-গৌরব শতগুণ ফুটাইয়া তুলিয়াছে! আবার বঙ্গদেশে মহা-শক্তির উদ্বোধন মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। অনন্তকাল সাগরের উর্ম্মিমালার তরঙ্গাঘাতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ আসিতেছে, যাইতেছে; কত শরৎ আসিয়াছে, কত গিয়াছে, কত আসিতেছে, কত আসিবে, আবার কতই না মুহূর্ত্ত মধ্যে অতীতের গ[illegible]র্ভশিয়া যাইবে। শারদীয়া উদ্বোধন শঙ্খধ্বনী এ ভারতভূমি কতই শুনিয়াছে, আরও কতই শুনিবে; কিন্তু কই! পূজার দলশ্রুতি কই? উদ্বোধন, আবাহন, বিসর্জ্জন যথাপদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে কিন্তু সঞ্চার কই?

স্মরণাতীত কাল হইতে এ বঙ্গদেশ মহাশক্তির অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু হে পাষাণ-কন্যে, তুমি তার ফলে তাহাকে কি দিয়াছ? মা, তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে না, পাষাণি, বঙ্গ-সন্তানের এ পূজা উপহারের বিনিময়ে তাহার প্রার্থনা তুমি কতদূর পূরণ করিয়াছ বল দেখি মা? কি ক্ষেম, কি বিজয়, কি শান্তি তুমি দিয়াছ বল দেখি মা! লোকের বুদ্ধি লোপ হইয়াছে, নিতান্ত মায়া-মোহ-পাশে আচ্ছন্ন বলিয়াই, তোমার ন্যায় মায়ের নাম আবার করিতে ইচ্ছুক হয়!

বৎসর বৎসরই তুমি আসিয়া থাক মা, এবারও আসিতেছ, কিন্তু কি বলিয়া তোমার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিব বল দেখি মা! কিসে আমরা তোমার মহাশক্তির পরিচয় পাইব বল দেখি মা!

হৃদয়ের ক্ষত এখনও শুকায় নি মা, তাহা খুলিয়া দেখাইতে গেলে, জ্বালা আরও বাড়িবে, কিন্তু না খুলিয়া যে আর পারি না!

এই সেদিন এ বঙ্গে যে কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গেল, তাহা দেখিলে, তাহা শুনিলে, তাহা স্মরণ করিলে, কার ইচ্ছা হয় যে আবার তোর মত পাষাণীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে!

অসুর-তেজোদৃপ্ত নরাধম ম্লেচ্ছগণ সেদিন জামালপুরে তোরই প্রতিমূর্ত্তির উপরে নির্ব্বিঘ্নে যে লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়া গেল, তাহা মনে করিলে কে বলিবে যে তুই অসুর-বিমর্দ্দিনী, শুম্ভ নিশুম্ভঘাতিনী, রক্তবীজ বিনাশিনী!

পাষণ্ডগণ তোরই অংশভূতা বঙ্গকুললক্ষ্মীগণের প্রতি যে হৃদয়বিদারক কাণ্ডের অভিনয় করিল, তাহা স্মরণ করিলে কে মনে করিতে পারে, যে তুইই মা "স্ত্রীয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু!"

তখন, হে দশপ্রহরণধারিণি! তোর সে সব সংহারচক্র কোথায় ছিল? তখন তোর অসীমানন্ত মহাশক্তির কণিকা দ্বারা তোর স্নেহের দুহিতাগণকে অনুপ্রাণিত করিতে কিসের বাধা জন্মিয়াছিল? তখন যদি ধরণী সেই সব পাষণ্ডগণের শোণিতধারায় রঞ্জিত হইয়া মার্কণ্ডেয় পৌরাণিক ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইত, তখন যদি তোর রণচণ্ডী কালিকারূপ ধারণ করিয়া তোর শক্তিদর্পিতা রমণীকুল পামরগণকে বিধ্বস্ত করিত, তাহা হইলে বুঝিতাম, যে বঙ্গের শক্তিপূজা সার্থক হইয়াছে।

তবে কি তুই কেবল পায়স, পিষ্টক, মিষ্টান্নে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বর্ণ রজতখণ্ড প্রণামী সংগ্রহের জন্যই বৎসর বৎসর আগমন করিয়া থাকিস্? শ্রীশ্রীচণ্ডী তোর যে মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে, সে মাহাত্ম্য কি কেবল কবি-কল্পনা, অথবা তাহা অতীতের মধ্যে পরিগণিত?

বুঝি না মা, অবোধ, অজ্ঞান আমি বুঝিতে পারি না, একি লীলা তোমার! তাই মনে সন্দেহ হয়, হৃদয়ে অপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে; তুই আছিস্ কি না! আমরা কি তবে বৃথা খড় দড়ি রং মাটীর পূজা করিয়া প্রতারিত হইতেছি? বল্ মা, বলে দে; কেন বঙ্গ বৎসর বৎসর তোর পূজা করিয়াও জীর্ণ হইতে জীর্ণতর, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর এবং দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতেছে! কেন এ ভারতে,—এ বঙ্গে আধিব্যাধি, শোকতাপ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে! কেন দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী ভীষণ বদন

একাদশ বর্ষ] কার্ত্তিক ১৩১৪। [৭ম সংখ্যা।

REGD. NO. C. 116.

আলোচনা।

Howrah 93

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

BENGAL LIBRARY 19 DEC 100 WRITERS' BUILDINGS

সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এ, শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক বি, এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র শেঠ, শ্রীতারা প্রসন্ন ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার দত্ত, শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ দাস গুপ্ত ও সম্পাদক।

শ্রীঅমৃত লাল কুণ্ডু

ম্যানেজার—আলোচনা সমিতি,

১০৮, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

Printed and published by **Nafar Chandra Dutta.**
Printed at **The Salkia Printing Works,** *Kaldanga Line, Salkia, Howrah and published at 108 Panchanantola Road, Howrah.*

কবিরাজ শ্রীসতীশ চন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণের

আয়ুর্ব্বেদ জলধি মথিত

সোমেশ্বর রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, গ্রহণী, অরুচি, হৃদরোগ, শ্বাসকাস,
ক্ষয়কাস, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণজ্বর, ধাতুক্ষয়

প্রভৃতি

পুরাতন জটিল রোগের একমাত্র মহৌষধ।

(যজ্জ্বরা ব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজম্ তদ্রসায়নম্।)

যাহা সেবন করিলে সকল রোগের বিনাশ হয়, তাহাকেই রসায়ন বলে।

অম্লপিত্ত শূলরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ! এই "সোমেশ্বর রসায়ন" সেবন করুন। সেবনের পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চোঁয়াঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা প্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গ নিবারণ হইবে। ১৫ দিন সেবন করিলে উৎকট ব্যাধি অম্লরোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। আহারান্তে যাহাদের পেটে ভাত থাকে না, তাহারা ২।৩ মাত্রা ঔষধ সেবন করিয়াই আশ্চর্য্য ফল অনুভব করিবেন; দেখিবেন, পরদিন বমনের উদ্রেক পর্য্যন্ত হইবে না। শরীর দুর্ব্বল না থাকিয়া সবল হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ বা দমকা মল নিবারণ হইবে। অম্লজনিত হৃদরোগ যথা—বুক ধড়ফড় করা, বুক ধড়ফড় করা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি আরাম হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে—সেবন করুন, জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে; অগ্নিমান্দ্য দূরে যাইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

সহজ শরীরে সেবন করুন—ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, শরীর আরও মোটা হইবে, গায়ের বল আরও বৃদ্ধি পাইবে, দুশ্চিন্তা দূর হইয়া মনে স্ফূর্ত্তি পাইবেন।

৪ আউন্স এক শিশি ১৲ টাকা, মাশুলাদি ৵০ আনা। ৩ শিশি ২৸০ আনা, মাশুলাদি ৷৶০ আনা। ৮ আউন্স এক শিশি ১৸০ আনা, মাশুলাদি ।০ আনা। ৩ শিশি ৫৲ টাকা, মাশুলাদি ১৲ টাকা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

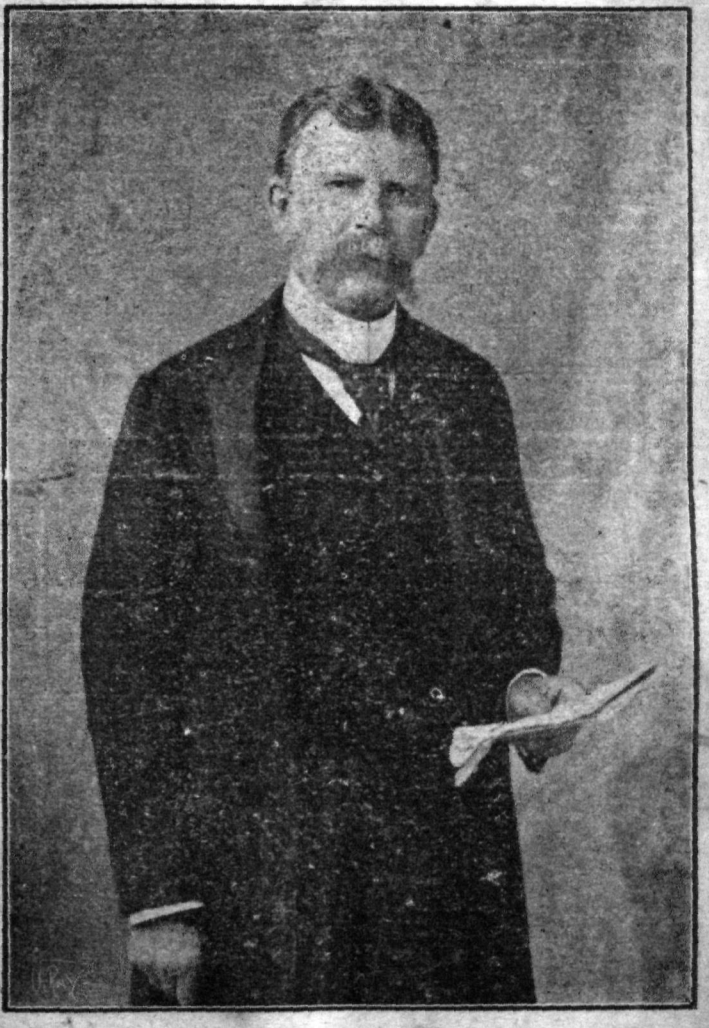

ভারতবন্ধু মহামতি কটন, কে, সি, এস, আই।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিজয়ার অভিবাদন।—বিজয়ার পর আমরা গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন, নমস্কার, ও আশীর্ব্বাদ করিয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। এখন আমরা স্বদেশ ও স্বজাতিকে চিনিতে পারিয়াছি; তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইতে শিখিয়াছি; তাই আশা আছে—এবার প্রত্যেক স্বদেশ ভক্ত মহাত্মা আমাদের এই ক্ষুদ্র কলেবরা "আলোচনার" প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

নিবেদন।—আমরা ক্রমান্বয়ে পত্র লিখিয়া এখন পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাহকের নিকট হইতে আলোচনার বার্ষিক সাহায্য আদায় করিতে পারি নাই। ভিঃ পিতে পত্রিকা পাঠাইলে; অনেকে তাহা ফেরৎ পাঠাইয়া আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্থ করেন। বৈশাখ মাস হইতে পত্রিকা গ্রহণ করিয়া তৎপরে মূল্য দিবার সময় যে সকল অভদ্র এইরূপ ভিঃ পিঃ ফেরৎ প্রদান করে—তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বদেশের কলঙ্ক—তাহাদের নাম আমরা সাধারণে প্রকাশ করিব। এক্ষণে গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন এই যে, আমরা আগামী মাসের পত্রিকা সকলের নিকট ভিঃ পিঃতে পাঠাইব, যাঁহাদের আপত্তি থাকে তাঁহারা সত্বর জানাইবেন।

চিত্র।—আমরা আশ্বিন মাসের আলোচনার সহিত ভারত-বন্ধু মহামতি এইচ, জে, এস, কটন, কে, সি, এস, আই, বাহাদুরের একখানি হাপটোন ছবি প্রকাশ করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম কিন্তু সময়ে তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায় প্রকাশ করিতে পারি নাই; তজ্জন্য এই মাসের পত্রিকার সহিত তাহা প্রদান করা হইল।

স্বদেশী আন্দোলন।— মহামায়ার কৃপায় এবার স্বদেশী আন্দোলন ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছে। নির্জ্জীব বাঙ্গালীর ক্ষীণপ্রাণে যে শক্তির সঞ্চার হইতেছে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। দৈব প্রদত্ত এই আন্দোলন বজায় রাখিতে পারিলে অচিরে আমরা

যে পুনরায় সুখের মুখ দেখিতে পাইব, পুনরায় আমরা যে আর্য্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব—তাহা কে না স্বীকার করিবে? দৈব যাহার সহায়, ছার মনুষ্য তাহার প্রতিকূলে দাড়াইলে ভয়ের কোন কারণ নাই। অতএব ভারতবাসী নির্ভয়ে স্বদেশী আন্দোলনে প্রাণপণ কর, তোমাদের মঙ্গল অবসম্ভাবী।

শঙ্খধ্বনি।

সকল মাঙ্গলিক ক্রিয়া কলাপে হিন্দু শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহার পবিত্রতা সাধন করেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ ধরিয়া আমাদের এই পবিত্র শঙ্খধ্বনির প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুর একতা স্থাপনের ইহা একটী প্রধান অবলম্বন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়ে তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদেই আপন মনোভাব সকলকে ব্যক্ত করিতেন; কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি মহা সমরে নারায়ণ অর্জ্জুনের সারথী হইয়া মঙ্গলময় শঙ্খধ্বনি করিয়াই বিপক্ষ পক্ষের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। ভক্ত প্রধান ভগীরথ পবিত্র শঙ্খধ্বনী করিয়াই, মহাশক্তি স্বরূপিণী, পতিত পাবনী গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্তে আনয়ন করিয়াছিলেন, সগরকুলতিলক মহাত্মা ভগীরথ অগ্রে অগ্রে শঙ্খধ্বনি করিয়া মহাশক্তি ভগবতী জাহ্নবীকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাই আবাহমানকালে শঙ্খধ্বনি হিন্দুর পক্ষে অতি পবিত্র, তাহাদের শাস্ত্র বিহিত এমন কোন ক্রিয়াকলাপ নাই, যাহাতে শঙ্খধ্বনি না হইয়া থাকে; —একতা সূত্রে আবদ্ধ হইবার এরূপ ভেরী বাদন আর নাই। "স্বদেশী আন্দোলন" আমাদের দৈব প্রণোদিত,—অতি মঙ্গলময় কার্য্য, পাপ, তাপ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী নাশ করিবার ইহাই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। এইরূপ মঙ্গলময় কার্য্যে আমাদের প্রতিদিন ঠিক এক সময়ে ভারতের সকল গৃহ হইতে শঙ্খরব হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আমাদের এই ধর্ম্মময় আন্দোলন সুদৃঢ় হইবে। এই পবিত্র ধ্বনির মধ্যে যে ধর্ম্মের একটী সূক্ষ্ম শক্তি পরিচালিত হয় তাহা প্রত্যেক হিন্দুই অবগত আছেন; ধর্ম্মকে জাগাইয়

করিবার জন্যই ভগবতীর এইরূপ আদেশ। অতএব ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু! আর্য্যগৌরব রক্ষার্থ এস, সকলে মিলিয়া এই শিবময়ী শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হই। প্রতিদিন রাত্রি নয় ঘটিকার সময় যখন হিন্দু গৃহস্থ সকলে দিবসের পরিশ্রম সমাধা করিয়া গৃহে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিবেন ঠিক ঐ রাত্রি ৯টার সময় ভারতের প্রতি গৃহ হইতে যেন ঐরূপ শঙ্খধ্বনি করা হয় তাহা হইলে আমাদের শক্তি জাগরিত হইবে; শক্তি-অংশ-সম্ভূতা হিন্দুর পতিব্রতা রমণীগণের দ্বারা ঐ শঙ্খধ্বনি যে কিরূপ ধর্ম্মপ্রদ, কিরূপ শক্তিসম্পন্ন, তাহা ভারতবাসীর চিরবিদিত। অসার প্রাণে শক্তি জাগাইতে হইলে, অধার্ম্মিকের প্রাণে ধর্ম্মের উত্তেজনা করিবার বাসনা থাকিলে, শক্তি-অংশ-সম্ভূতা হিন্দু ললনাগণের ঠিক এক সময়ে শঙ্খধ্বনি বড়ই প্রয়োজন। অতএব সকলে প্রত্যহ রাত্রি ৯টার সময় এইরূপ শঙ্খনিনাদ করিতে ভুলিবেন না—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

আলোচনা সমিতি।

রাজধানীর রোজনামচা।

চুনিবাবুকে বাটী যাইবার সময় যখন আবার কবে কলিকাতায় আগমন হইবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তাঁহার মৌনভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছি, এমন সময়ে তিনি উত্তর করিলেন,—"আরে ভায়া, তোমার কলিকাতায় আসিব কি, এখানে গোলযোগের জ্বালায় নিদ্রা হয় না; দিবাভাগে ফেরিওয়ালার হাঁকে চমকাইয়া উঠি, আর রাত্রে অপর বাটীতে কড়া নাড়িলেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।" আর কোন গুরুতর অভিযোগ নাই দেখিয়া তখন তাঁহাকে বিদায় দিলাম, কিন্তু সেই অবধি ফেরিওয়ালার দৌরাত্ম্যের কথা ভুলিয়া যাই নাই। অভ্যাস বশতঃ রাজপথের চিৎকার আমাদিগের কাণে বেহাগ রাগিণীর ন্যায় মিলাইয়া যায়, কিন্তু পল্লীবাসীর নিকট তাহার আদর নাই; সেই নিমিত্ত একটী দিন ছুটী পাইয়া যে রোজনামচা লিখিয়াছি, পাঠক পাঠিকাকে তাহা উপহার দিলাম। পাঠান্তে লেখকের বিনীত দরখাস্তের প্রতি তাঁহারা মনসংযোগ করিলে বাধিত হইব।

১। "বৈষ্ণবের গান।"

আম : একটু বেলায় উঠা অভ্যাস, এ বিষয়ে আমি Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise, এ পুরাতন উপদেশটা সম্পূর্ণ মানিয়া চলিতে পারি নাই। রাত্রি ১১॥০টার পূর্ব্বে চক্ষে নিদ্রা আসিত না; সুতরাং ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত সুষুপ্তি নিমগ্ন থাকিব, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আজি কি জানি কেন, মুন্সী-পালিটীর প্রথম ময়লা গাড়ীর শব্দ কাণে বাজিতে না বাজিতেই সেই চির-মাখমচোরের গীতে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সেকালে হিন্দু মুসলমান রাজাগণের বৈতালিক থাকিত, তাহারা প্রাতে ও রাত্রে মাঙ্গলিক গাহিয়া রাজন্যবর্গের নিদ্রাভঙ্গের ও নিদ্রাযোগের সহায়তা করিত। এখন বিংশ শতাব্দী চলিয়াছে, দেশে আর রাজাও নাই, বৈতালিকও নাই; কিন্তু তথাপি কলিকাতা-বাসী সামান্য ব্যক্তিমাত্রেও গীতরসাস্বাদনে বঞ্চিত নহেন। রাতভিখারী এক পয়সার প্রত্যাশায় বাছা বাছা শ্যামা বিষয়ক পদ শুনাইবে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট কিছু চাহিবে না। প্রাতঃকালে বৈষ্ণবগায়কও কত প্রকার গীত শুনাইবে। ঐ দেখুন আলখেল্লা পরা, কৃষ্ণশ্মশ্রুমণ্ডিত বদন নবীন বৈষ্ণব আনন্দ-লহরীতে ঝঙ্কার দিতে দিতে প্রভাতী গাহিতেছে—

"ভোর ভাইল যশোমতী বোলওয়ে
উঠ নন্দলালারে॥"

গানের সহিত পায়ের ঘুমুর তালে তালে বাজিয়া উঠিতেছে। আহা! কেমন নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে! প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ কি প্রেমই না উহার প্রাণে ঢালিয়া দিয়াছেন, নহিলে উহার গানে প্রাণ নাচিয়া উঠে কেন? গান পাল্টাইয়াছে, এবার গাহিতেছে—

"ঐ গৌর এসেছে মথুরায়।"

"আজকা হিতবাদী বাবু, হিতবাদী ও নবশক্তি।"

বৈষ্ণব গাইতে গাইতে চলিয়া গেল এখন বেশ ফর্সা হইয়া আসিয়াছে। সহরে নৈসর্গিক শোভা কেহ দেখিতে চাহে না, ভাঙ্গা মেঘের উপর অর্দ্ধমগ্ন বালার্কের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই. এখানে প্রাতে নিথর নিশ্চল প্রকৃতির দিকে কেহ তাকায় না, মানুষগুলা যেন কলের পুতুলের মত চলা, ফেরা করে, পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর ন্যায় যথাসময়ে আহার করে, কার্য্য করে, নিদ্রা যায়। ইহারা সভ্য সমাজের নেতা, সভ্যতার স্রোত যে অপ্রতিহতপ্রভাবে বহিয়া

তাহা ঐ ফেরিওয়ালার হাঁকে বুঝিতে পারিতেছেন না কি? বাঙ্গলা দৈনিক কাগজের এখন কলিকাতায় অভাব নাই; কিন্তু আবার এমন লোক আছেন যাঁহারা দুই বেলা কাগজ পড়িতে না পাইলে সন্তুষ্ট হন না। সকালে যাঁহারা হিতবাদী বা নবশক্তি পাঠ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আবার বৈকালে "সন্ধ্যা" না পাঠ করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু বাঙ্গলা দৈনিক অপেক্ষা যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহাদিগের নিকট ইংরাজীরই আদর বেশী। ইংরাজী সংবাদপত্র সচারাচর চিৎকার করিয়া রাস্তায় ফেরী করে না বটে, কিন্তু ট্রামে উঠিলেই বেঙ্গলী, বন্দে মাতরম প্রভৃতি এখানকার পছন্দসই মতের পত্রিকাগুলি পাওয়া যায়। বাঙ্গলা সংবাদ পত্র বিক্রেতারাও ২।১০খান করিয়া ইংরাজী কাগজ রাখে, ইচ্ছা করিলেই তাহা ক্রয় করিতে পারা যায়।

৩। "জয় রাধে—ভিক্ষে পাই বাবা!"

ক্রমে বেলা বাড়িতেছে। শ্রেণীবদ্ধ তুষার ধবল হর্ম্মরাজীর উপরিভাগ হইতে নবারুণ-রশ্মি নিম্নগামী হইয়াছে। সহরে ইতিমধ্যেই কাজের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে, এক অস্ফুট কোলাহল কর্ণগোচর হইতেছে। নিজ নিজ কর্ম্মে মন দিয়াছে; সুতরাং "জয়রাধে, ভিক্ষা পাই বাবা" বলিয়া দ্বারে ভিখারী দেখা দিবে না কেন? অন্য সকল ব্যবসায়ীর ন্যায় তাহাদিগেরও বাহির হইবার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় আছে! ভিখারিণী বৈষ্ণবীর পরণে একখানি থান, যথারীতি তিলক সেবা করিয়াছে, এত প্রাতেও তাহার ওষ্ঠাধর তাম্বূলরাগারক্ত দেখিয়া বিরক্ত হইবার প্রয়োজন নাই; উহাকে মুষ্টিভিক্ষা দিতেই হইবে, না দিলে গৃহস্থের অনেক অকল্যাণ করিয়া যাইবে, তাহা গৃহলক্ষ্মীরা কোনরূপেই ঘটিতে দিবেন না। আবার ভিখারী আসিয়াছে; বৈষ্ণব বেশধারী হৃষ্টপুষ্ট যুবা পুরুষ, উহার স্কন্ধে, ঝুলি; ইহাকেও ভিক্ষা দিতে হইবে, নতুবা এত বড় বাড়ীর বড়বাবুর অনেক গুপ্ত কথা তাহার নিকট শুনিতে হইবে। একজন বিখ্যাত সাহিত্য-সেবী একটী চমৎকার গল্প বলিয়াছেন। একদা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জোর করিয়া ভিখারী তাড়াইয়া দেওয়া ও ধাক্কা দেওয়া অপরাধের মকদ্দমা উঠে, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে ভিখারীকে গৃহস্থের ধাক্কা দেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তার পর কেমন করিয়া ভিখারী তাড়ান যায় তাহার একটী ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহাকে সাহেব

পাড়ার প্রাসাদ ও দ্বারের চোবে দ্বারবান ছাড়িয়া কলিকাতার উত্তরাংশে বাস করিতে হইলে. তিনি এই উপদ্রবের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইতেন।

৩। "চাই আলু পটল পিয়াজ চাই।"

উত্তম বন্দোবস্ত; যাহার বাজারে গিয়া দ্রব্যাদি খরিদ করিবার লোক নাই, ফেরিওয়ালা তাহাকে তরকারী যোগাইতে আসিয়াছে। কিন্তু এ কি! উহার ভারের একদিকে পটল আর একদিকে আলু আর পেঁয়াজ। এই হিন্দু সহরে হিন্দু পাড়ায় দিন দুপুরে নির্ব্বিবাদে আলু পেঁয়াজ একত্র বিক্রয় হইতেছে। বিধবা আছে, দেবতা আছেন, কিন্তু কাহারও ইহাতে আপত্তি দেখি না। শুনা যায় সেকালে ম্লেচ্ছের খাদ্য আঘ্রাণ করিয়াছিল বলিয়া বঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদারগণ পিরালী নামে অভিহিত হইয়া পতিত হইয়া আছেন, কিন্তু এখন অবাধে কলিকাতার রাস্তায় আলু পেঁয়াজ একত্র বিক্রয় হইতেছে। হায় মনু! হায় ব্যাস! হিন্দুদিগের এখন কি অধঃপতনই না হইয়াছে! হিন্দু অহিন্দু হইতে চাহে বলিয়াই ত সমাজের এই দুর্দ্দশা!

৪। "চাই মুগকা ডাল।"

মুগের ডাল উপাদেয় খাদ্য। লোকে রহস্য করিয়া বলে 'বাবু মুগের ডাল খান না—খান না, না পান না" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কলিকাতার ন্যায় সহরে কেহই স্বগৃহে মুগ ভাঙ্গিয়া ডাল তৈয়ারী করান না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ডালের আদর বেশী। সুতরাং কলিকাতাতেও ডাল ভাঙ্গিবার বাছিবার ও বাটী বাটী যোগাইবার ভার উত্তর পশ্চিমবাসীরই উপর ন্যস্ত বড় বড় ডালগোলা সবই বাঙ্গালীর কিন্তু ভূনাওয়ালাই সেই ডাল খুচরা বিক্রয় করে। পূর্ব্বে ডাল বাছিবার ও পরিষ্কার করিবার ভূনাওয়ালীর একটী সুখ্যাতি ছিল, সে সুখ্যাতি এখনও আছে; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এখন সে পরিশ্রম করে কি না সন্দেহ। বাঙ্গালী মাছ তরকারি পাইলেই সন্তুষ্ট, তাই অপরকে ডালের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্যের সররবাহকারক করিয়া রাখিয়াছে।

৫। "শিশি বোতল বিক্রি! পুরান কাগজ বিক্রি!"

ডালওয়ালা ডাল বেচিয়া চলিয়া গেল, এবার বিক্রিওয়ালা আসিয়াছে; সে কিছু কিনিতে চাহে। যদি খালি বোতল বা পুরাতন খবরের কাগজ থাকে, তাহাকে বাহির করিয়া দিতে পার। কাল

বোতল একটী এক পয়সা, সাদা বোতলের দাম কিন্তু আরও অধিক। এখন বিংশ শতাব্দী চলিয়াছে, বোতলের অভাব কোথাও দেখা যায় না, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে এরূপ ছিল না; এখন নৌকার মাঝি চিরপরিচিত বংশ তৈলাধার পরিত্যাগ করিয়াছে; কৃষক তাহা ত বহুদিনই ছাড়িয়াছে। কেহ কিন্তু ভাবিয়াছেন কি এত বোতল কোথা হইতে আসিল? স্বদেশী আন্দোলন ত এই দুই বৎসরের শিশু মাত্র, কাঠের ও লৌহের কারখানার কঠোর শ্রমসাপেক্ষ কার্য্য তাহার মাংসপেশী সহিবে না; তাই সভ্যতার লীলাভূমি স্বাধীন ইংলণ্ড হইতে এই বোতল আমদানী হইয়াছে। স্যার টমাস্‌রো স্বহস্তে, সযত্নে, এই বোতল পূর্ণ করিয়া সুধা বলিয়া এই গরল প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন; তিনিও এ তরল সুধা ভ্রমেই পান করিয়াছিলেন। সেই অবধি ভারতে বোতলের প্রসার, এখন বোতলে আর সুবিধা হয় না বলিয়া এ সুখাদ্য পিপা ভরিয়া আসে। ইংরাজ বণিক ছলে বলে কৌশলে এক কালে মোগলকে ধ্বংস করিয়াছে, এখন তোমারও ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আবগারি বিভাগের আয় বৎসর বৎসর বাড়িতেছে, এবং আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের "বণিক রাজা এইবার আমদানী মদ্যের উপর অধিক শুল্ক চাপাইব, এইবার যাহাতে জনসাধারণে সহজে মদ্য ক্রয় না করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিব" বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইতেছে না। হে বণিক, আমরা অনেক দিনের নিস্ব ও কৃপণ জাতি, একবার তোমার মোহজালে জড়িত হইয়া তোমার মন্ত্র গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমাদিগের সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে। ইংরাজী সভ্যতার প্রথম বন্যা আমাদিগের অনেককে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদিগের শক্তি অনেক বাড়িয়াছে। একজন বিখ্যাত সাহিত্যসেবী লিখিয়াছেন:—

The cry is constantly raised that young Bengal is afraid to aron its liberalism, but surely the avowal as regards the consumption of spirituous liquors is distinct enough. Sisses (medicine phials) are of course asked for, but you see every bikrewalla passing by loaded with champagne. Peer and Brandy bottles with thei labels on. It is an every day and every

hour matter now, and the number of brkrewallas is so large that one is staggered to compute the amount of consumption it represents.

ঈশ্বরেচ্ছায় এখন কাল ফিরিয়াছে। বাঙ্গালী যুবক এখন মদকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। চার পয়সা সের পুরাতন খপরের কাগজ। এক সেরে এক তাড়া কাগজ হইবে? ইহাতে সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে; স্বরাজের দাবী আছে; ইংরাজ গভর্ণমেণ্টর প্রতি শ্লেষ আছে, টীক আছে, টিপ্পনী আছে; সমালোচনা আছে, কত রাজা, মহারাজা ও রায়বাহাদুরের নাম আছে, আরও কত কি আছে! এখন প্রত্যেক সম্পাদকীয় মন্তব্যের মূল্য কত তাহা সুধীর পাঠক হিসাব করিয়া দেখিবেন, বাইনোমিয়েল থিয়োরেম (Binomial Theorem) কসা আমার একটী বন্ধু ইংরাজী হিসাবে অসুবিধা দেখিয়া মাথা ঘামাইয়া বাঙ্গালা হিসাবে হয় ক্রান্তি হয় তিল হয় বসিয়াছিলেন; হিসাবের কাগজখানি হারাইয়া গিয়াছে; নতুবা পাঠকের কৌতূহল নিবারণ করিতাম।

৬। "চাই বিঁড়ে বাড়ন।"

ছেলেদের একটী ভয়ানক অপরাধ, তাহারা যাহা দেখে তাহাই খাইতে চায়। খাইতে পারুক বা নাই পারুক যাহা সম্মুখে পাইবে তাহা তুলিয়া মুখে দিবেই। মুখে দিয়া ঐ দ্রব্যের যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করিবে। তোমার কিন্তু তাহার এই কার্য্যে সহানুভূতি নাই, পাছে চিঠি লিখিতে বসিলে খোকা তোমার খাম খাইয়া ফেলে বা কালিটুকু শেষ করিয়া ফেলিয়া দিয়া দোয়াতটীর উপর আপনার ক্ষীণ দন্তের বলপরীক্ষা করে, সেই ভয়েই তুমি ত্রস্ত। তোমার গৃহিণী বেশ বিন্যাস করিতে বসিয়া খোকাকে দেখিয়া ডরাইয়া উঠে, পাছে তাহার চিরুনি খাইয়া দেখে বা তাহার সিন্দুরের কৌটাটী খুলিয়া সিন্দুরটুকু ফেলিয়া দেয়। সেদিন বাঁড়ুয্যেদের অতীন বাবুর ছেলে বিঁড়ে বাড়নই খাইতে চাহিয়াছিল! কিন্তু খোকা এত আলাতন কেন করে—তাহা তুমি একদিনও ভাবিয়া দেখ নাই। সেবার প্রসী সাহেব যে দেশ মাতাইয়া এতগুলি টাকা তুলিয়া লইয়া গেল, তাহা তুমিই ত তাহার পকেটে কৌতূহলী হইয়া ঢালিয়া দিলে। তুমি সেই আশ্চর্য্য ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিলে, এবং বিশ্বাস করিয়াছিলে, তাহার যথার্থ একটী স্বরূপ দেখাতেই ত তোমার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া প্রসীর তামাসা

দেখিতে গিয়াছিলে! তবে খোকার নিন্দা কর কেন? চক্ষুদ্বারা যাহা দর্শন করা যায়, তাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে, স্পর্শ না করিলে ত কিছুই মীমাংসা হয় না; খোকা তাই সকল দ্রব্য মুখে পুরিয়া সব পরীক্ষা করে, তাহাকে দোষ দিও না।

৭। "হাঁসের ডিম গো, হাঁসের ডিম।"

প্রায় মধ্যাহ্ন হইয়া আসিল, ফেরীওয়ালা ডিম যোগাইতে আসিয়াছে। আঃ! লোকটা কি চিৎকারই না করিতেছে। হাঁসের ডিম ত এখন পুত্রের মত সস্তা নাই, লোকে ইহা এখন বড় পছন্দ করে না, তাই ডিম ওয়ালার ভাল পসার নাই। এখন লোকে মুরগীর ডিম খায়, হাঁসের ডিমের সঙ্গে তাই সে এখন মুরগীর ডিমও রাখে। শুনিতে পাই কেহ কেহ হাঁসের ডিম কাঁচাই খাইয়া থাকেন, মুরগীর ডিমের ত কথাই নাই। একদা একজন বিলাত ফেরৎ ডাক্তার আমাকে ঔষধের পথ্যস্বরূপ প্রত্যহ প্রাতে দুইটী করিয়া মুরগীর ডিম খাইতে বলিয়াছিলেন. প্রথমদিন কষ্টে সৃষ্টে খাইয়াছিলাম, দ্বিতীয় দিবসে বমি আসিল, এবং তৃতীয় দিবস তাহার ঔষধ ত্যাগ করিয়াছিলাম। এখন তাহা মনে করিতেও যে প্রায় জ্বর আইসে!

৮। "দহি চাই গো, দহি!"

দুপুর বেলা তুমি এক হাঁড়ী খাটালের টোকো দই লইয়া পাড়া মাতাইতেছ কেন বাবু? তোমার দধি দেখিতে এত সুন্দর ও উহা এরূপ সুলভ যে তাহাতে অনেক ঔদারিকের জিহ্বায় জল আসিবে। কিন্তু এই অম্ল রসের যে তোমার খরিদ্দার হইতে নারাজ হইবে! তোমার একসের দধিতে গৃহস্থের যে দুই সের চিনি আবশ্যক হইবে, তুমি চলিয়া যাও, কেহ তোমার ক্রেতা নাই। বৈকালে মালাই দই খাইয়া ঔদরিক আশা মিটাইবে।

৯। "পুরান লোহা বিক্রি!
পুরান ছাতা বিক্রি!
ন্যাকড়া কানি বিক্রি!"

বিজ্ঞানবিৎ বলেন কোন বস্তুরই ধ্বংস নাই। সাধারণ লোকে যাহাকে ধ্বংস বলে তাহা রূপান্তর মাত্র। বাতী পুড়িয়া গেল, কিন্তু তাহা নষ্ট হইল না, তাহা অঙ্গার, অম্লজান ও জল প্রভৃতিতে পরিণত হইল মাত্র। আর এক দিক দিয়া দেখ, পুরাতন ছাতা বা পুরাতন লোহা কোনটারই

বিনাশ নাই। পুরাতন কাগজ কুটিয়া কাগজ প্রস্তুত হইবে, পুরাতন ছাতার কলে নূতন কাপড় বসাইলে আবার নূতনের ন্যায় হইবে, পুরাতন লোহার হাঁসকল, তালা ইত্যাদি পোড়াইয়া গলাইয়া আবার কত নূতন জিনিস হইবে। অণু, পরমাণুর বিনাশ নাই, প্রাণের বিনাশ আছে কি?

১০। "ঢং! ঢং!! ঢং!!!"

কি গণ্ডগোল! কর্ণ যে বিদীর্ণ হয়! হে ক্যাংসবণিক! তুমি এক মোট বাসন লইয়া রাস্তায় ফিরি করিতে বাহির হইয়াছ কেন? আমার ত বাসনের আবশ্যক নাই। পূর্ব্বে বৎসরান্তে আমি মহামায়ার চরণে ফুল বিল্বদল দিতাম তাহাতে আমার বাসন আবশ্যক হইত; পূজায় বাসন লাগিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান করিতে ও সামাজিক দিতে পিত্তল কাঁসার তৈজসপত্র ক্রয় করিতাম। কিন্তু এক্ষণে আমি আর পূজা করি না। আমার এ সকলের আর আবশ্যকও হয় না। দেখ পূর্ব্বে আমরা ৪টী ভ্রাতা একত্র ছিলাম, জমি জায়গার আয় হইতে দেশের সংসার খরচ চলিত, এবং আমাদিগের উপার্জ্জিতের অধিকাংশ দুর্গোৎসবে ব্যয় হইত; কখন কখন বা ২।৪ খানা অলঙ্কারও প্রস্তুত হইত। কিন্তু এক্ষণে আমরা পৃথকান্ন; তাই পূর্ব্বের ন্যায় পূজা করিতে পারি নাই, আর তোমার থালা ঘটিও সেই নিমিত্ত আমার আবশ্যক হয় না। আমার বাটীতে এখন এনামেলের বাসন অনেক আছে, আমি তাহা বেশ পছন্দ করি তাহা নহে, কিন্তু আমার গৃহিণী বলেন, যে এ বাসন খুব ভাল। মাজিতে বা ধুইতে কোন কষ্ট নাই, পড়িলেও ভাঙ্গে না।

১১। "ভাল ভাল নয়া নয়া সাপ,
সাপে বাঁদরে খেলা করে বাবু!"

নাসারন্ধে বাঁশের বাঁশীটী লাগাইয়া একটী মিঠে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে বেদে চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে দুইটী রূপী বানর। যদি কিছু খরচ করিতে প্রস্তুত থাক, তাহা হইলে তামাসা দেখ। সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে সত্য, কিন্তু তবুও ত বেদে যেমন করিয়া উহাকে লইয়া খেলা করে, তুমি ত ঐরূপ ভাবে খেলা করিতে সাহস করিতে পার না। ছেলেরা সাপের খেলা দেখিতে বড়ই ভালবাসে, কিন্তু এমন ছেলেও আছে, যাহারা দিবাভাগে সাপের খেলা দেখিয়া আহ্লাদ করিয়া রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতে "ঐ সাপ" "ঐ সাপ,"

করিয়া চিৎকার করিয়া উঠে। সাপুড়েরা গান গাহিয়া সাপ ধরে শুনিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া সর্প সকল গর্ত্তের বাহির হয়, এবং কৌশলে তখন তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। কেহ কেহ বলেন, তাহাদিগের নিকট এক প্রকার শিকড় আছে, ঐ মূল থাকিলে আর সর্প দংশন ঘটে না। আমার কোন বন্ধু এক সময়ে আমাকে ঐ প্রকার একটী শিকড় আনিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ সুবিধা হয় বলিতে পারি না। যে কোন কারণেই হউক, সাপ ধরা আশ্চর্য্য কাণ্ড বলিতে হইবে।

১২। "চুড়ি লিবি গো, চুড়ি!"

১৩। "চুড়ি চাই, সাবান চাই, খেলনা চাই।"

প্রথমটী বামাকণ্ঠ, দ্বিতীয়টী কর্কশ-স্বর এক মুসলমান যুবক। বড়ই সাদর মধুর সম্ভাষণে চুড়িওয়ালী চুড়ি লিবি গো বলিয়া খরিদ্দার আহ্বান করিতেছে, মস্তকে যে পসরা দেখিতেছ, তাহাতে নানাবিধ চিত্র বিচিত্র চুড়ি আছে, তাহার কতকগুলি গালার কতকগুলি মাটীর, কাচের চুড়ি অতি অল্প, উহাদিগের দাম অধিক নহে দেখিতেও সুশ্রী। অন্দরে গিয়া কুলাঙ্গনাদিগের মনের মতন চুড়ি পরাও তখনকার দৃশ্য আমার বড়ই নয়নাভিরাম মনে হয়, তাই আমি তোমাকে এত ভালবাসি। তুমি আরতি রক্ষার সহায়তা কর, তুমি বিলাসিতার সহচর নহ। কিন্তু হে মুসলমান যুবক, তুমি আমার চক্ষুশূল! বিদেশী বণিক নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, ভারতবাসীকে যে ভঙ্গপ্রবণ, মূল্যহীন, অলীক ব্যবসার জালে জড়িত করিতে চাহে, তুমি তাহার বার্ত্তাবহ। আমরা ঐ সমুদ্রপারাগত বণিকের মোহ জাল ছিঁড়িতে চাহি, আমরা আর কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে তোমার ঐ কাচ কিনিব না, তুমি এখান হইতে দূর হও।

১৪। "কাটাও শিল, জাঁতা!"

১৫। "কেরসিন তেল!"

১৫। "রিপুর কর্ম্ম!"

১৬। "জুতিয়ে ব্রুশ!"

কেহ অনর্থক চিৎকার করে না। কেহ কিছু বিক্রয় করিবে, কেহ কোন কাজ করিয়া দিয়া তোমার সহায়তা করিবে, কেহ তোমার প্রত্যহ ব্যবহার্য্য কোন বস্তু যোগাইবে, তাই দ্বারে ফিরিতেছে; আমরা ইহাদিগকে বিনা বাক্যব্যয়ে অন্যত্র চিৎকার করিতে দিতে পারি।

১৮। "ঘটী বাটী সারাবে!
ঘড়া পিলসুজ সারাবে!
ভাঙ্গা বাসন সারাবে!"

মেরামত—কেবল মেরামতেরই কথা। তুমি ভাঙ্গা বাসন সারাও, আবার কতদিন তাহা ব্যবহার কর। কিন্তু তোমার রাজার জাতি যাহারা, যাহারা তোমার অনুকরণের স্থল, তাহারা ত বাসন সারায় না! তাহারা কেমন সুন্দর কাচপাত্র ব্যবহার করে, ভাঙ্গিয়া গেলে ফেলিয়া দেয়, উহা সস্তাও বেশ! কিন্তু একবার ভাঙ্গিলে তাহার আর কিছুই আদায় নাই। তোমার জলখাবার গেলাসটী ২৫ বৎসর ব্যবহারের পর যদি ভাঙ্গে, তাহা হইলে বদল দিয়া অন্য একটী গেলাস পাইতে পার, কিন্তু আমি ময়লা গাড়ীতে প্রত্যহ ২।১০টা ভাঙ্গা কলাই ও কাচের গেলাস লইয়া যাইতে দেখিতে পাই, তাহাতে ক্রেতাদিগের কি লাভ হয় জানি না!

* * * * * *

১৯। "বাত ভাল করি গো, ব্যথা ভাল করি!"

এ আবার কি? কলিকাতার সহরে ত ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, ধাই, অবধৌতিক কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু তথাপি এ ভীষক পদব্রজে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে কেন? ইহাতে অবশ্যই তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থোপার্জ্জন হইয়া থাকে, নতুবা এ বাত ব্যথার চিকিৎসকের মোটেই দেখা পাওয়া যাইত না! ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশ হইতে কুপ্রথা সব উঠিয়া যায় নাই; দৈববলের উপর বিশ্বাসও চলিয়া যায় নাই, সেই নিমিত্ত এখনও এই বিংশ শতাব্দিতেও বাত ব্যথা ভাল করিবার বিশেষ বৈদ্য আছে। তাহারা এখনও পুরাতন প্রথা অনুসারে চলিয়াছে; নূতনের স্রোত এখনও তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই।

২০। "চাই রুটী বিস্কুট!"

২১। "রেসমী মিঠাই!"

২২। "বাগ্ বাজারের রসগোল্লা! সরভাজা!"

দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। স্কুলের ছুটী হইয়াছে—কলেজও ভাঙ্গিয়াছে। খাবারওয়ালারাও রাস্তায় বাহির হইয়াছে। পাঁউরুটী, বিস্কুট ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন বিক্রীত হইতেছে, আমরা ইহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া অগ্রসর হই।

২৩। "চানাচুর বাদাম ভাজা!"

২৪। "চাই অবাক জলপান!"

সবই চাউল, মটর ও ছোলা ভাজা, কিন্তু অবাক জলপান বিক্রেতা একটী গণ্ডগোল না বাধাইয়া ছাড়ে না।

অবাক জলপান সখের রাজা।
সতের রকম সাতাশ মজা॥
খেলে পরে স্বাদ পারবে জান্তে।
ইচ্ছে হবে সব মুলিয়ে কিন্তে॥

অবাক জলপান বিক্রয়ের এই ছড়া। ক্রেতারও অভাব নাই, কেহ কেহ শুধু ছড়াটী শুনিবার জন্যই এক পয়সার কিনিয়া ফেলিলেন। পাঠক পাঠিকারা অবাক জলপান ভালবাসেন কি না জানি না; লেখকের কিন্তু এই রকম হলুদ মাখান চাল ছোলা ভাজায় সানে না, থালা পুরিয়া তৈল ও লবণ সংযুক্ত গরম মুড়ি আবশ্যক হয়। যাঁহারা বোতলবাহিনীর সেবক, তাঁহারা অবশ্য এই অবাক জলপানের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছেন।

২৫। "চাই বরফ!"

দিন শেষ হইয়া আসিল; দিবাকর সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর অস্তাচলে গমন করিলেন। সন্ধ্যারাণী আপনার ধূসরাঞ্চলখানি বিছাইয়া ক্লান্ত নাগরিক-গণের শ্রম দূর করিতে যত্নবান, কিন্তু তাহারা সেই স্নেহাঞ্চলের মধ্যে বিশ্রাম-কাতর শিশুর ন্যায় আবদ্ধ থাকিতে চাহেনা; তাই গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়া সেই অন্ধকার ঘুচাইতে তৎপর হইল। এই ভর সন্ধ্যাবেলাই বরফ বিক্রেতার বাহির হইবার সময়। তালতলা ব্ল্যাক ইয়ার সেকালের বরফ ওয়ালার অনেক সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; সেই বরফ ওয়ালার সহিত এখনকার বরফ ওয়ালার আজিও কোন পার্থক্য দেখি না। সে এখনও রাবড়ী, মালাই কুলপি বিক্রয় করে: পূর্ব্বে যে যে স্থানে তাহার যাতায়াত ছিল, এখনও ঠিক সে সকল স্থানেই তাহার যাতায়াত আছে। যদি বরফওয়ালার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাহারও যাইবার আবশ্যক থাকে, তাহা ঐ বেলফুলওয়ালার। সারা বৎসর বেলফুল ফুটে না, বিক্রয়ও হয় না; কিন্তু ফুলওয়ালা অন্য ফুল বিক্রয় করিতে তথায় গমন করে; যখন ফুল থাকে না, তখন তাহার অন্য ব্যবসায় আছে। এ স্থির সন্ধ্যায় তাহাদিগের অনুসন্ধানে আর কাজ নাই; গাড়ী যুড়ী

যেখানে দাঁড়াইয়াছে, বৈদ্যুতিক আলোকের ঝাড় জ্বলিয়াছে, ঘুমুর ও তবলায় ঘা পড়িয়াছে, আমরা সে স্থানে তিষ্ঠাইতে পারি না। আমাদিগের চরিত্র বিজ্ঞান, বা সমসাময়িক বিজ্ঞান লিখিবার এখন তত তাড়াতাড়ি নাই। আর কয়েক ঘণ্টা যাবৎ রাস্তায় আর কোন চিৎকারওলা যাইবে না, আমিও একটু বিশ্রাম লাভ করিতে সক্ষম হইব।

২৬। "ইয়াপীর মুস্কিল আসান!"

এক্ষণে মুস্কিল আসানের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিদায় গ্রহণ করি। দীর্ঘশ্মশ্রু-বিমণ্ডিত বদন একটী মুসলমান ফকির পিত্তলের প্রকাণ্ড রেকাবের উপর একটী আলোক বসাইয়া লইয়া পথ বাহিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে গম্ভীর স্বরে "মুস্কিল আসান" বলিয়া হাঁক দিতেছে। উহাকে একটী পয়সা দিলে সকল মুস্কিলের আসান হইবে, খোকার অসুখ সারিয়া যাইবে, স্বামীর স্বভাব নম্র হইবে, শাশুড়ী ননদের যন্ত্রণার লাঘব হইবে! হিন্দু গৃহিণী উহাকে একটী পয়সা দিবেনই! একটী পয়সায় জগতে এত হয়? পাঠক পাঠিকাগণ এতক্ষণে বোধ হয় বড়ই বিরক্ত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু যখন এতদূর আসিয়াছি, আপনাদিগের নিকট একখানি দরখাস্ত পেশ না করিয়া ছাড়িব না। এই আজব সহর কলিকাতায় প্রত্যহ কিরূপ কোলাহল হয়—তাহা আপনাদিগকে যখন শুনাইলাম, তখন একটী পুরস্কারের আশা থাকুক আর নাই থাকুক, লোভ অবশ্যই থাকিতে পারে। সুতরাং এতদ্বারা নিবেদন করিতেছি যে আপনারা আমার মরুব্বি হউন, আমি কর্ম্মপ্রার্থী। আমার গুণের মধ্যে (আর গুণই বা কেন, মুরব্বি থাকিলে গুণপনার আবশ্যক হয় না) আমি লোকের মনোরঞ্জন করি। আপনাদিগের মধ্যে অনেকেই বড়লোক আছেন সুতরাং আপনাদিগের নিকট দীনের প্রার্থনা এই যে আপনারা কলিকাতা কর্পোরেশেনের চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট আমার একখানি পরিচয় নামা পত্র দিউন। যদি চাকুরি খালি থাকে (তাহা অবশ্যই নাই), তাহা হইলে তিনি আমাকে কলিকাতার ফেরিওয়ালা দিগের কর্ত্তা করিয়া দিবেন। আমি তাহাদিগকে লাইসেন (license) দিব, এরা যাহাতে কেহ অত্যধিক বা অত্যল্প চিৎকার না করে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইব। আমার ব্যবস্থা অনুসারে কেহই কর্কশ স্বরে রাজপথে চিৎকার করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইবেক নাই, যে করিবে

তাহার যথোচিত দণ্ড হইবে। এবং যাহার যেরূপ মাল বিক্রয় করা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত গোলযোগ করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইবে না। কলিকাতা মুন্সপালিটীতে এত প্রকার চাকুরি আছে, আমার জন্য এই একটী নূতন পদ করিলে করদাতাগণের অর্থের অপব্যয় হইবে না। আপনারা বড়লোক সবই জানেন, সুতরাং অলমতিবিস্তারেন।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ।

বক্ষের রতন।

একটী সে পরাণের-আধ মুকুলিত
নব কিশলয়;
একটী সে পরাণের পিযুষ আধার
স্নেহের আলয়।
ওই মাতা নিদা ঘোরে উন্মুক্ত হৃদয়ে
মাখিছে স্বপন;
রহিয়াছে মুগ্ধ হৃদে বক্ষে মুখ ঢাকি
"বক্ষের রতন।"

২

নিদ্রাঘোরে বক্ষে করি সদ্য-জাত শিশু
আবেশ পরাণে;
কি যে মদিরার স্রোতে ভেসে যায় কোথা
নিশীথ স্বপনে।
স্নেহের ভাণ্ডার খুলি উচ্ছ্বাসের ভরে
পাতিয়া জীবন,
লইয়াছে দয়াবতী দয়ার আধার
"বক্ষের রতন।"

৩

এত দয়া এত স্নেহ বহে যার হৃদে
সে কিগো মানবী?
কে বলে মানবী তাঁরে, সে যে পুণ্যবতী

স্বরগের দেবী।
এ বিশ্ব সংসার মাঝে তুমি গো জননী
সবারি প্রধান;
আর সে জনম্ ভূমি—মোরা সব যার
"বক্ষের রতন।"

৪

হেথা ওই প্রান্তভাগে অবগাহি দেহ
ভারত জননী—
শ্রান্তি-ক্লিষ্ট সন্তানের শ্রান্তি হরিবারে
সাজিছে আপনি
আমরা গো ত্রিংশকোটী পুত্র বর্ত্তমানে
মা কবে ক্রন্দন;
বিদেশীর অত্যাচারে ভুলেছি এখন
"বক্ষের রতন।"

শ্রীনগেন্দ্র নাথ চন্দ্র।

'রাখি' বন্ধন।

সুমঙ্গল 'রাখি' করে হে বিশ্ব-জননি,
তুমি দাড়ায়েছ আসি আজিকে আপনি
জাগ্রত সন্তান পাশে, দিতেছ বাঁধিয়ে
পরস্পর প্রাণে-মনে হৃদয়ে হৃদয়ে
অনন্ত অক্ষয় ডোরে! কোন্ তুচ্ছ কাল,
কোন্ তুচ্ছ বাধা-বিঘ্ন ব্যবধান-জাল
পারে তা'করিতে স্পর্শ মুহূর্ত্তের তরে?
হে জননী স্নেহময়ী, প্রতি ঘরে ঘরে
তোমারি অর্চ্চনা আজি প্রীতি প্রেম-ফুলে
করিতেছে বঙ্গবাসী হিংসা-দ্বেষ ভুলে
প্রশান্ত একান্ত মনে! তুমি মা জননী,
দিয়েছ ঘুচায়ে আজি দুঃখের রজনী
তোমারি কল্যাণ মূর্ত্তি অন্তর-মাঝারে
স্থির সৌদামিনী রূপে করিছ প্রকাশ!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

নিঃসম্বল।

কি দিয়ে এবার পূজিব তোমায়,
আমার হৃদয়-রাণি!
একে একে একে সব ফুলগুলি
তোমারি চরণে দিয়াছিত তুলি,
দাঁড়াইয়া রয়েছি বাঁধি অঞ্জলি,
মুখেতে সরে না বাণী।
আমার দীনতা, সকল হীনতা
জান তুমি দেবী অম্বি!
বিশ্বে আছিনু সহায় বিহীন,
সজল নয়ন বদন-মলিন,
পথে পথে ভ্রমি কেটে যেত দিন,
তুমি গো করুণা-ময়ী!
ব্যথিতের ব্যথা পরাণে বুঝিয়া,
করিলে সেবক তব,
সেবিয়া তোমার রাতুল চরণ
লভিনু আর এক নূতন-জীবন,
ফুল্ল হইল বিশ্ব বদন
হেরি সব অভিনব।
খুলে দিলে তব উদ্যান দ্বার,
পুষ্পিত তরু লতা,
বিস্ময়ে হেরি, বিবসা মাধুরী,
এলাইয়া কম-কৃষ্ণ-কবরী,
পবন পরশে শিহরি শিহরি,
ফুল সনে কহে কথা।
বিম্ব অধর পরশে তাহার
হেরিনু কুসুম ফুটে,
হাসি ঝাপাইয়া রচে-তার রূপ,

অধর-মদিরা, সুরভীর কূপ
ভরি দেয়, ওই লোলুপ-মধুপ
তারি তরে মরে ছুটে।
পশি উদ্যানে, দিবস যামিনী
তোমারি পূজার তরে,
পুলক পরশে ভাব বিহ্বল,
ভুলিয়া ভুবন মুগ্ধ পাগল,
অমল বিমল কুসুম কোমল
ফিরিনু চয়ন করে।
দিনে দিনে দিনে শুকাইল সব
পুরাতন তরু লতা,
শেষ কটি ফুল করিয়া চয়ন,
আজি এসেছিনু পূজিতে চরণ,
তুমি না তুলিলে করুণ-নয়ন
মোর সম্বল কোথা!
খুলে দাও পুনঃ নব নব দ্বার
নূতন ফুলের রাশি,
নূতন মাধুরী অধর-তাজ্ঞে
মদিরা-ধারায় করিবে সিক্ত
ভুলিয়া গাঁথিয়া অধম ভক্ত,
চরণে পরাবে আসি।

শ্রীতারা প্রসন্ন ঘোষ।

কাক।

নহেক মধুর জানি আমি ওরে
তোর আন্‌মনা ডাক,
আমি মনোরম নহে তোর রূপ
ওরে রূপহীন কাক

চিরদিন তবু ভালবাসি তোরে
সুখ প্রভাতের সাথী,
তোর ডাক শুনি বুঝিতাম আমি
নাহি আর নাহি রাতি।
টোকা ভরা মুড়ি খই লাড়ু লয়ে
খেতাম উঠানে বসি,
থাক্‌তিস্ মোর চারি পাশ ঘেরি
বেড়াতিস্ কাছ ঘেঁসি।
ছড়ায়ে দিতাম মুঠা মুঠা মুড়ি,
ক্ষুধা ত যেত না তাতে,
জোর করে লাড়ু কাড়িয়া নিতিস্
ঠোকারে দিতিস্ হাতে।
তবু চিরদিন ভালবাসিয়াছি,
সাঁজে আমগাছ থেকে
দল বেঁধে যবে উড়িয়া যেতিস্
নীড় পানে একে একে।
আমি বসে বসে শুনিতাম সবে
দেখিতাম চেয়ে চেয়ে,
অজ্ঞাত এক বিরহ বেদনা
দিত হৃদিখানি ছে'য়ে।
আজি এ প্রবাসে তোর ডাক শুনি
হতেছে উদাস প্রাণ,
ভাসিয়া উঠিছে নয়নের মাঝে
সেই প্রিয় বাড়ীখান।
মনে পড়ে সেই আগুন পোহানো
সূর্য্যি মামারে ডাকা,
গায়ে দিয়ে সেই ছিটের দোলাই
দুয়ারে বসিয়া থাকা—
মনে পড়ে সেই সুখ-সাথী-দল

কত গেছে তার চলি,
কালের পরশে শুকাইয়া গেছে
কত অস্ফুট কলি।
শূন্য সে দ্বারে আজি কাহারেও
যায়না যায়না দেখা
পৌষ প্রভাতে শুধুরে সেখানে
রবি চেয়ে থাকে একা।
সুদূর প্রবাসে আজি বারবার
শুনি ওই ডাক তোর,
কত বিচিত্র সুখের চিত্র
ভাসিছে পরাণে মোর।
অজ্ঞাত দেশ অচেনা সকলি
নূতন যে চারিধার
তোরে মনে হয় চিরপরিচিত
কত যেন আপনার।

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক, বি, এ।

প্রাণের হাহাকার।

বসন্তের ফুল-ভরা নিকুঞ্জ-কানন
নিদাঘ-তপন ঘায় পড়ে এলাইয়া!
ভাবি মনে মনে হায়! বড় ভয় হয়,
কোন দিন ভেঙ্গে যাবে সুখের স্বপন!
এ পোড়া হৃদয় সদা করে হাহাকার,—
মানবের আশা ভরা হাসি মুখ দেখে—
এ নয়ন হ'তে হায় ঝরে বারি ধারা!

কারো মুখ পানে চেয়ে মিলায়ে নয়ন—
না পারি কহিতে কথা,—হিয়া কেঁপে ওঠে
তারাটী কখন বুঝি পড়িবে খসিয়া!
বিবাহের বাদ্যভাণ্ড, বংশী আলাপনে—
এদুটী শ্রবণে হায় জেগে ওঠে শুধু—
মুমূর্ষুর অনুগামী কীর্ত্তনের রোল!
নব-বর-বধূ-শুভ-বিবাহ-বাসরে—
বামাকণ্ঠ বিমিশ্রিত শুনি হুলুধ্বনি
মনে প'ড়ে যায় শুধু (হায় রে অদৃষ্ট!)
বিধবার হাহাকার হৃদয়বিদারি!
নব-শিশু-মুখ হেরি সূতিকা আগারে,
নয়ন-পলক যেন না ফেলিতে হায়,—
শ্মশানের দৃশ্যরাজি শিহরি দেখিয়া!
স্নেহময়ী প্রসূতির অমিয় বচনে
স্পষ্ট যেন শুনি আমি (বিদগ্ধ-শ্রবণ!)
পুত্রহারা জননীর করুণ-বিলাপ!
এ পোড়া জীবন আর বহা নাহি যায়।
অকস্মাৎ যদি কভু উৎসবে মাতিয়া
উচ্চহাসি হেসে ফেলি ভুলিয়া আপন—
সে হাস্য তরঙ্গ মিশি পরম হিল্লোলে,
হাহাকার রবে যেন ব্যঙ্গ করে যায়!
সে হাসির রোল যেন আকাশে উঠিয়া,
বিশ্ব মাঝে ঢেলে দেয় করুণ-ক্রন্দন!
সহসা স্বপনে জাগি, গভীর নিশীথে—
শুনি যেন, দিগান্তরে দিগ্‌বধূগণ
সে হাস্য তরঙ্গ স্মরি, পশিয়া আঁধারে,
গেয়ে যায় তপ্তশ্বাসে রহিয়া রহিয়া—
বসন্তের ফুল-ভরা নিকুঞ্জ-কানন
নিদাঘ-তপন যায় পড়ে এলাইয়া!

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র শেঠ।

গিরিজা প্রসন্ন ও কয়েকখানি পত্র ও উত্তর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেক সময় স্বাধীনতা-প্রিয় পুরুষগণ শাস্ত্রের কথা না মানিয়া অনেক কার্য্যে স্বেচ্ছাচারী ভাব প্রদর্শন করেন। শাস্ত্রের নিয়ম পালন করিতে হইলে অনেকটা আত্মসংযম চাই, স্বার্থ ও সুখ ভোগ ত্যাগে অভ্যস্ত হওয়া চাই। কিন্তু সেরূপ শিক্ষা অন্তর্জ্জগতের; তাহা ত আজকাল দৃষ্ট হয় না। কাজেই পুরুষ অনেক সময় হৃদয়কে সংযত করিতে না পারিয়া স্ত্রীর সামান্য ত্রুটীর জন্য গুরুতর দণ্ডের বিধান করেন। অনেক স্ত্রীলোক এমন উদ্ধত আছেন, যে তাঁহারা সামান্য অপরাধে অথবা নিরপরাধে স্বামীর দণ্ড নীরবে শির পাতিয়া ধারণ করিতে অনিচ্ছুক, ইহা দ্বারা স্বামীর হৃদয় এত ক্রোধপূর্ণ হয় যে তৎকালে স্ত্রীর ইহকালের সুখের আশা বিমুখ করিতে স্বামী বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করেন না। স্বামী যখন সকল সময়েই স্ত্রীর প্রভু, জীবন রক্ষক, তখন যদি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কোনও কারণে ক্রোধরাশী হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তদ্দ্বারা যে অনায়াসেই বিষময় ফল উৎপাদন করিতে পারে, তাহা বোধ হয় স্বীকার্য্য।

যখন আমরা কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র-প্রণয়ে নিরাশ হইতে দেখিয়াছি, তখনও সূর্য্যমুখী ও অন্যান্যের সহিত কুন্দের নম্রভাব, আবার যখন প্রণয়ের পরিতৃপ্ত ভাব দেখিয়াছি, তখনও কুন্দ মাটীর ন্যায় নরম। নগেন্দ্র রাগ করিলে কুন্দ কোনও প্রত্যুত্তর দিতে পারিত না, কেবল মুখ লুকাইয়া কাঁদিত যেন সে স্বামীর নিকট কত অপরাধ করিয়াছে, নতুবা স্বামী অসন্তুষ্ট কেন? এত যে নম্রতা, ইহা দ্বারা কাহার প্রতি না সহানুভূতির উদ্রেক হয়? কাহার না হৃদয় আকৃষ্ট হয়? কিন্তু এই নম্রতা নৈসর্গিক স্বভাবজ হওয়া চাই। নতুবা এই নম্রতার স্ফূর্ত্তিতে স্বভাবে কোমল ভাবটুকুর উদয় হয় না। তাই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"স্ত্রীলোকের নম্রতা একখানি সুন্দর অলঙ্কার। হীরা, মতি, মাণিক্য যত উজ্জ্বল দেখা যায়, স্ত্রী-চরিত্রে নম্রতা ততোধিক সুন্দর দেখায়। যাহা নম্র, তাহাই সুন্দর, বৃক্ষ ফলভরে যখন নত হয়, বৃক্ষ বড় সুন্দর, মনুষ্য সৎ স্বভাবে যখন নত হয়, মনুষ্য দেবতা। বুঝিলে, এই নম্রতার কি অর্থ? সাধু যখন সদ্‌গুণ

সম্পন্ন হইবে, সদ্‌গুণের, আদর করিতে শিখিবে ও কর্ত্তব্য পালনে ব্রতী হইবে, তখন তাহার অপেক্ষা যত শ্রেষ্ঠ জিনিস, তৎপ্রতি লক্ষ্য যাইবে আর রূপের অভিমান, বিদ্যার গৌরব, ধনের মাৎসর্য্য কিছুই থাকিবে না। প্রকৃতির গুণে মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িবে। যেরূপ বৃক্ষ ফলভরে নত হয়, তেমনি স্ত্রীলোক সদ্‌গুণের ভরে নত হইয়া পড়িবে। এই নম্রতা গুণের অভাবে পতি-প্রেমিকা ভ্রমর স্বামী-প্রেমে বঞ্চিতা হইয়াছেন। এখনও অনেক স্ত্রীলোক দেখা যায় যে, পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি কি অন্য ক্ষমতাপন্না হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হয়েন, ও পাড়া প্রতিবেশীর সহিত যদৃচ্ছা ব্যবহার করেন; এমন কি মধ্যে মধ্যে ঐ জাতীয়া স্ত্রীলোকগণকে স্বামীর সহিত কলহ করিতেও উদ্যত হইতে দেখা যায়। ঈদৃশী স্ত্রীলোক, সকলকে সমান চক্ষে দেখিয়া, সকলের দুঃখকষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সমদর্শী ভাবের বিকাশ দেখাইয়া যে আনন্দটুকু লাভ করা যায়, তাহা ত ভোগ করিতে পারেনই না, পক্ষান্তরে বিষয়-মদে মত্ত হইয়া যাহাকে লইয়া সংসার ধর্ম্ম শিখিতে হয়, যাহার ভালবাসায় স্বর্গীয় সুখ, সেই স্বামীর সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কতদূর ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের কার্য্য! হায়! হায়! যখন আমরা ধন, জন প্রভৃতি অসার বস্তু অপেক্ষাও সুখ লাভের অন্য কতক-গুলি উপকরণ দেখিতে পাই এবং তাহার স্ফূর্ত্তি ভিন্ন যখন আমরা প্রকৃত সুখটুকু হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি না, তখন কেন বৃথা এই বিষয়-লালসায় অন্ধ হইয়া দিন দিনই জীবনের সুখের পরিমাণ কমাইতেছি। গ্রন্থকার নম্রতা ও কোমলতার সংমিশ্রণজনিত চরিত্রকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"ইহার আর একটী বিশেষ গুণ যে, আমার ন্যায় স্বামী ইহাতে বড় বাধ্য থাকে।" দেখিলে, গ্রন্থকারের কত সরল উক্তি, কত ধর্ম্মভাব, কত বিনয়। রমণীগণ! তোমরা বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে, সকল সময়ে এই গুণটীর আশ্রয় গ্রহণ করিও, তোমাদের স্বামী কখনই পথভ্রষ্ট হইবেন না; পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় তোমাদের হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ রহিবেন। আর যদি নিতান্তই পথভ্রষ্ট হয়েন, তাহা হইলে তোমাদের বিনয় রূপ সুধা অস্ত্র পুনঃপুন স্বামীর উদ্দেশে প্রয়োগ করিও, যতই কেন স্বামী নিষ্ঠুর হউন না, তোমাদের বিনয় দেখিয়া নিশ্চয়ই স্বামী বিনীত হইবেন।

গিরিজা প্রসন্ন কৃত্রিম চরিত্র অপেক্ষা স্বাভাবিক চরিত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। এই কৃত্রিম চরিত্রে ও স্বাভাবিক চরিত্রে কি

প্রভেদ দেখা যাউক। প্রথমতঃ মানুষ যে সমাজে বাস করে, তাহার চরিত্রেও সেই সমাজের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। এখন যে সমাজ প্রকৃতির নিয়মের সহিত যতদূর সম্বন্ধযুক্ত, সেই সমাজের লোক নৈসর্গিক ফলে ততদূরই স্বাভাবিকতা লাভ করে। আমরা এই নৈসর্গিক কারণে অথবা প্রকৃতির সহিত অধিক সম্বন্ধ রাখা প্রযুক্ত, কুন্দনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার চরিত্রে স্বাভাবিক লক্ষণ বেশী স্ফুটতর দেখিতে পাই। স্বভাব মধুর, সরল ও সৌন্দর্য্য-দায়ক, তাই ইহাদের চরিত্রেও স্বাভাবিক শোভার অপূর্ব্ব সম্মিলন।

দ্বিতীয়তঃ যাহার চরিত্র যতদূর স্বাভাবিক, তাহার চরিত্র ততদূর প্রকাশ-মান। স্বপ্রকাশ হেতু আমরা স্বাভাবিক চরিত্র যেটুকু চিনি, সেই চেনাটুকু খাঁটি। এবং খাঁটি চিনিতে পারি বলিয়াই তাহাকে ভালবাসি, তৎপ্রতি সঞ্চালিত হই। যে চরিত্র কৃত্রিম তাহার সারভাগ আমরা হঠাৎ ধরিতে পারি না, এইজন্য কৃত্রিম চরিত্র আমাদের হৃদয়ে অধিক স্থান পায় না। বিশেষতঃ কৃত্রিম চরিত্রের সহিত স্বভাবের নৈকট্য সম্বন্ধ নাই বলিয়া তাহা মধুর বোধ হয় না।

গ্রন্থকার একস্থানে স্ত্রীলোকদিগকে সত্যভাষিণী হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন "মনুষ্য অন্তঃকরণ নিতান্ত দুর্ব্বল, ইহাতে একটী অন্যায় কার্য্য করিলেও অন্যায় হয় না, আমি তোমার প্রত্যেক অন্যায় কার্য্যের অবতারণা ক্ষমা করিতে পারি। ভালবাসা, ভক্তি, কিংবা প্রণয়ের কথাই বল, সকলের মূল ভিত্তিই বিশ্বাস। যে স্থলে বিশ্বাস নাই, সে স্থানে প্রণয় ভালবাসা ত দূরের কথা, একটী সামান্য জিনিসও অপরকে দিয়া মানব সুখী হয় না।

এই যে বিচিত্র সংসার, এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ বৃত্তির একটী আধার প্রাপ্ত হই। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ইহারাই সুখের আধার। কেহ বা পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য প্রণোদিত হইয়া দিবারাত্র তাঁহাদের উদর পোষণের জন্য পরিশ্রম করিতেছে। কেহ বা দারাপুত্রের লালন পালনের জন্য একাকী পথের সম্বল বিহীন হইয়া বন্ধুহীন অরণ্যে চাকুরির প্রত্যাশায় ঘুরিতেছে ও দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিধান করিয়াও কৃতার্থ হইতেছে। কে বলিবে যে, এত কষ্ট সহিষ্ণুতা, এত সুখ বিসর্জ্জন স্পৃহা শূন্যতার মধ্যে অপূর্ব্ব সুখের উচ্ছ্বাস উহাদের হৃদয়ে জাগরিত হয় না! এই যে বিশুদ্ধ সুখটুকু, ইহা কি আত্মবোধ অথবা ভালবাসা হইতে জন্মে না? যতদিন

একে অপরকে নিজস্ব বোধ করে, ততদিন বিশ্বাসের মূল ছিন্ন হয় না; ভালবাসা সজীব থাকে। কিন্তু একবার বিশ্বাসের মূলে কাঁটা পড়িলে, অথবা আপন কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি হইলে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের উপর ভক্তি, প্রণয়ী প্রণয়িনীর প্রতি ভালবাসা স্থির রাখিতে পারে যে স্থলেই এই ভালবাসার বন্ধন শিথিল হইতে দেখি, সেই স্থলেই একে অন্যের প্রতি পাপাচরণ করেন, শেষে যখন উহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় তখন আমরাও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় পাপের বিরাট ফল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

দাম্পত্য প্রণয়ের বিচ্ছেদ সময় আমরা ঠিক পাপটীকে এইরূপ অলক্ষ্য ভাবে কার্য্য করিতে দেখি। পুরুষ যদি পাপপথে প্রথম প্রবেশ করেন, তাহা স্ত্রীর বহু দিনের ভালবাসার আঘাত দিতে সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে কপট চরিত্র ধারণ করেন, আর স্ত্রী যদি নরকের দিকে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে অন্তঃকরণের পাপরাশি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া উপরে বেশ জীবন-সর্ব্বস্বিনী সাজিয়া স্বামীর মনোমুগ্ধ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু এইরূপ ব্যবহারে পাপ কেহ অনেক দিন চাপিয়া রাখিতে পারেন না। পাপের একটী বিচিত্র গতি—উহার প্রথম সোপানে পাপিষ্ঠ অবতরণ করিয়া নিজের অন্তরের দিকে যদি না তাকাইয়া সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে সে পাপটী আর হৃদয় হইতে পৃথক্ হইতে চাহে না। ক্রমান্বয়ে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু এই পাপের নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সরল ভাবে—হৃদয়খানি ফুটাইয়া পরস্পরকে দেখান। যখন পুরুষের কর্ত্তব্য স্ত্রীর ধর্ম্মাচরণে উৎসাহ প্রদান, এবং স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামীর ধর্ম্মে সহায়তা দান, তখন উহাদের মধ্যে স্ব স্ব দোষগুণ যদি পরিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে একের উৎসাহ ও চেষ্টায় সহজেই অপরের দোষভাগ কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ পথ অবলম্বন না করিয়া কেহ যদি কপট বেশ পরিধান করতঃ পাপ গোপন করিতে অভ্যস্থ হয়, তাহা হইলে যতদিন পূর্ব্ববিশ্বাস শিথিল না হয়, ততদিন একের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অপরে ঘৃণিত ও ভীষণ পাপের সৃষ্টি করিতে পারেন। আমরা অনেক পুরুষকে তাহাদের স্ত্রীর অন্তরখানিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না দেখিয়া স্ত্রীর কথার বশবর্ত্তী হইয়া সংসারস্থ অপরের সঙ্গে বিনাদোষে ঝগড়া বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইতে দেখি। ইহার ফলে পারিবারিক শান্তির অন্তর্ধান হইয়া সংসারটী পাপের

বিশ্বাসস্থল হইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকদের চরিত্রে সেই দোষটী যাহাতে স্পর্শ না করে, তজ্জন্য ধীর ও সংযত হইয়া গ্রন্থকার স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন—"আমি তোমার প্রত্যেক অন্যায় কার্য্যের প্রথম অবতারণা ক্ষমা করিতে পারি," এই কয়েকটী কথার অর্থ কি? পাপীকে পাপ মুক্ত করার জন্য গ্রন্থকারের চেষ্টা। অনেক পুরুষ আছেন, যাহারা স্ত্রীর কোনও একটী দোষ পাইয়া তাহার সংশোধন করার জন্য বিশেষ শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে স্ত্রী আর কোনও সময়ে স্বামীকে পাপের কথা বলিয়া তৎপ্রদত্ত সদুপদেশ লাভ করিতে সাহসী হয় না। এইজন্য চরিত্রটী মার্জ্জিত হওয়ার পরিবর্ত্তে দোষনীয় হয়। পক্ষান্তরে অন্যায় আচরণের বিষয় স্বীকার করিলে সংশোধন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। তাই গ্রন্থকার দাম্পত্যপ্রণয়ের মূল দৃঢ় করার জন্য স্বামীকে স্ত্রীর মিথ্যা কথার প্রতি ঘৃণা করিতে উপদেশ না দিয়া তাহার পাপটীর কারণ প্রথমতঃ জ্ঞাত হইয়া ধীরে ধীরে তাহার সংশোধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি কেবল মিথ্যা কথা প্রভৃত স্থূল পাপের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সূক্ষ্ম পাপেরও বিচার করিয়া বলিয়াছেন—কথার অর্থ কি? শব্দ বিশেষ দ্বারা প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা চাই। তবে যে শব্দদ্বারা তাহা না হয়, সে কথাই নহে।" দেখিলে কথা বলার জন্য কত সতর্কতা, একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি যাহাদের লক্ষ্য আছে, অধমকে উত্তম শ্রেণীতে উঠাইতে যাহাদের অকৃত্রিম চেষ্টা, তাহাদেরই এই প্রণালীতে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করা সম্ভব। তাই গ্রন্থকারের জবনী লেখার সময় সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা রজনীকান্ত গুপ্ত বলিয়াছেন, যিনি প্রকৃত ভাগবৎ নহেন, তাহা দ্বারা এ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। গিরিজা বাবু প্রকৃত ভাগবৎ ছিলেন, তাই তিনি রমনীগণকে ধর্ম্ম বিষয়ক এত মূল্যবান উপদেশ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী।

মলহর রাও।*

(১)

বর্ত্তমান হোলকার রাজবংশের স্থাপয়িতা, বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ, মলহর রাওয়ের জীবনী বর্ত্তমান যুগের এক উপাদের বস্তু। এমন শিক্ষাপ্রদ জীবনী আছে কিনা সন্দেহ। জেমস্ এব্রাহাম গারফীল্ড কাঠুরিয়ার কার্য্য হইতে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেণ্টের পদে উন্নতি হইয়াছিলেন দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু মলহর রাও যে তদপেক্ষাও হীনাবস্থা হইতে স্বীয় প্রতিভা ও পুরুষকার বলে রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন তাহা অনেকেই জানেন না। তজ্জন্য আজ বহু শিক্ষাপ্রদ, কৌতুকবহ, বিচিত্র মলহর-চরিত্র, আলোচনার পাঠক পাঠীকাদিগকে সাদরে উপহার দিতেছি।

হোলকার বংশ।

হোলকার রাজবংশ জাতিতে শূদ্র। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধাঙ্গাড় বা গাড়ী বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই গাড়ী বংশ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মথুরার অন্তর্গত গোকুল নগরে বাস করিতেন। পরে তাঁহারা রাজপুতানার মেওয়ারের অন্তর্গত চিতোরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বহু পুরুষ যাবৎ বাস করেন। ইহার পর তাঁহারা দক্ষিণাপথের অন্তর্গত আরাঙ্গাবাদ জেলার কোন স্থানে গিয়া বসবাস করেন। এই স্থানে বাস করিতে করিতে তাঁহারা কোন সুযোগক্রমে পুণার বিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী নীরা নদীর তীরে কিঞ্চিৎ ভূমি লাভ করেন। এই স্থান হইতেই তাঁহাদের বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

হোল গ্রাম।

তাঁহারা যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহা হল বা হোল নামে অভিহিত হইত। ইঁহারা হল গ্রামের অধিকারী বলিয়া হলকার বা হোলকার নামে অভিহিত হন।

খান্দাজী হোলকার।

মলহর রাওয়ের পিতার নাম খান্দাজী হোলকার। হলগ্রামে আসিবার

---

* এই প্রবন্ধে লেখকের সর্ব্বস্বত্ব রহিল। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে পত্রান্তরে বা পুস্তকান্তরে ইহা উদ্ধৃত করা নিষিদ্ধ।

পর ইঁহারা মোড়ল বা ছোগলার কার্য্য করিতেন। খান্দাজী একাদশ ছেগলা ছিলেন। খান্দাজী ক্ষেত্রে গিয়া স্বহস্তে হল চালনা করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন, এবং চাষবাসের পর বাটী আসিয়া কম্বল বুনিতেন! খান্দাজী ক্ষুদ্র আশা ও ক্ষুদ্র আকাঙ্খা লইয়া সামান্য চাষার ন্যায় জীবন কাটাইতেন। নিম্ন শ্রেণীর কৃষকেরা যেমন কুসংস্কারাপন্ন হয়, খান্দাজীও তদ্রূপ ছিলেন। ইনি শিবাজী বা ঔরাঙ্গজেবের সমসাময়িক লোক।

মলহর রাও।

হোলকার বংশাবলীর তালিকায় একাধিক মলহর রাওয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মলহর রাওই হোলকার বংশের স্থাপয়িতা, এবং তাঁহারই জীবন আখ্যায়িকা এই প্রবন্ধে আমরা প্রকাশ করিতে যাইতেছি। মলহর রাও, খান্দাজী হোলকারের এক মাত্র পুত্র। অনুমান ১৬৯৩ খ্রীঃ অব্দে ইনি এই দীন হীন কৃষকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বয়স মাত্র ৯।১০ বৎসর, তখন তিনি পিতৃহীন হন। মলহর পিতৃহীন হওয়ার পর নানা কারণে তাঁহার মাতার সহিত তাঁহার পিতৃবংশীয় লোকের মনান্তর ঘটে। এইজন্য তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া আপন ভ্রাতা নারায়ণজী বার্গলের আশ্রয়ে চলিয়া যান। খান্দেশের অন্তর্গত তালন্দ গ্রামে নারায়ণজীর যৎসামান্য ভূসম্পত্তি ছিল। তদ্দ্বারাই কোন প্রকারে তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না হইলেও নারায়ণ রাও ভগিনী ও ভাগিনেয়কে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন না।

মলহরের বাল্যকাল।

অপগণ্ড বালক হইলেও নারায়ণ রাও মলহরকে গৃহে বসাইয়া রাখিলেন না, তিনি তাঁহাকে আপন মেষপালনে নিযুক্ত করিলেন। মলহর বহু বর্ষ যাবৎ এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই মেষ চরাইবার কালে মলহরের ভাগ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। মাঠের মধ্যে মেষবৃন্দকে ছাড়িয়া দিয়া মলহর প্রতিদিন যখন রৌদ্রের মধ্যেই শয়ন করিতেন, তখন এক প্রকাণ্ড বিষধর সর্প আসিয়া তাহার ফণার সাহায্যে তাঁহাকে ছায়া প্রদান করিত। যতক্ষণ না তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত, ততক্ষণ সর্প তাহাকে ছাড়িয়া যাইত না। অন্যান্য লোকের সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণজী যখন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন—তাঁহার

ভাগিনেয় এক অসাধারণ পুরুষ হইবে। তজ্জন্য তিনি মলহরকে কোন উৎকৃষ্টতর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন।

কাদ্দাম বঁদী নামক এক মারাঠা ভূম্যধিকারীর অধীনে নারায়ণ কার্য্য করিতেন। সুতরাং নারায়ণের কিঞ্চিৎ আধিপত্য ছিল। তিনি কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। সেই ক্ষমতা বলে নারায়ণ তাঁহার ভাগিনেয়কে তাঁহারই মনিবের অধীনে এক অশ্বারোহী সৈনিকের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। বুদ্ধিমান মলহরের ক্ষমতা ও প্রতিভা অনতিকাল মধ্যেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। একবার নিজামের অধীনে কোন যুদ্ধে গমন করিয়া তিনি সুকৌশলে এক সেনাপতিকে বধ করায়, তাঁহার যশোসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। শীঘ্রই তাঁহার পদোন্নতি হইল, এবং নারায়ণজী তদ্দেশীয় রীতি অনুসারে আপন প্রিয়তমা দুহিতা গৌতমাবাঈয়ের সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। গৌতমা বাঈ যে একজন পরম বুদ্ধিমতী এবং ধীশক্তিসম্পন্না রমনী ছিলেন, পরে তিনি তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন।

মলহর রাও যখন খান্দাজী কাদ্দাম বঁদীর অধীনে সেনানীর কার্য্য করিতেছিলেন, তখন পেশওয়ার একদল সৈন্য তাঁহার মনিবের ভূমি অতিক্রম করিয়া কোন স্থানে যাইতে উদ্যত হয়। ইহাতে মলহর রাও বিরক্ত হন, এবং অমোঘ বীরত্বের সহিত সেই বিপুলবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া দেন। এই তরুণবয়স্ক যুবকের বীরত্বের কথা অচিরেই পেশোয়ার কর্ণগোচর হইল। তিনি গুণের আদর করিতে জানিতেন, সুতরাং বালকের এই হঠকারিতায় বিরক্ত না হইয়া বিশেষ আনন্দের সহিত তাহাকে এক প্রধান সেনানীর পদে নিযুক্ত করিলেন। মলহর ১৭২৪ খ্রীঃ অব্দে এই পদে নিযুক্ত হন, এবং স্বীয় প্রতিভাবলে মাত্র চারি বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি ১২টী জেলা বা মহালের কর্ত্তৃত্ব পদ লাভ করেন। ইহার পর ১৭৩১ সালে তাঁহাকে একেবারে ৭০টী জেলার কর্ত্তা করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরবর্ত্তী বৎসরে মালওয়ার গবর্ণর দিয়া-রায় বাহাদুরের সহিত পেশোয়ার এক যুদ্ধ বাধে, সেই যুদ্ধে মলহর দিয়া-রামকে বধ করিয়া আরও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

যখন মারাঠাদের অধিকার বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত পহুঁছে নাই, তখন মলহর রাও অশেষ বিক্রমের সহিত নীজারের অন্তর্গত মহেশ্বর জেলা অধিকার

করেন, এবং মহেশ্বরের প্রধান নগরে আপন প্রধান কার্য্যালয় স্থাপন করেন। পরে তাঁহার পরিজনবর্গেরা এই সূত্রে পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক কাল এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস গুপ্ত।

সমাজ ও স্বদেশী।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশী আন্দোলনে অনেক প্রকারেই সাফল্য লাভ করিতেছি। স্বদেশী দ্রব্যাদি এখন বাজারে যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। এদেশবাসী যে সকল দোকানদার এখনও আপনাপন দোকানে বিদেশীয় দ্রব্য রাখেন, মনে মনে তাঁহারা প্রকৃতই সঙ্কুচিত ও লজ্জিত থাকেন, এবং নিজেকে অপরাধীর ন্যায় মনে করেন। ইহাতে স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অধুনা "স্বদেশী" সমাজের অঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। যাহা স্বদেশী নহে—তাহা আমাদের সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিতে এখন আর সমর্থ নহে, তাহা ধনীর বিলাস গৃহের নিভৃত নিকেতনে স্থান পাইলেও জনসাধারণের মধ্যে সমাদৃত হইতেছে না—প্রত্যুত উহা জনসাধারণের প্রতিকূল আলোচনার বিষয়রূপেই গণ্য হইতেছে! ইহাতেই বুঝা যায়, স্বদেশী এদেশে অবশ্যই স্থায়ী হইবে।

এমন দিন ছিল যখন স্বদেশী কেবল হুজুগেই এদেশে প্রাদুর্ভাব পাইয়াছিল, যখন কেবল বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের আন্দোলনের সহিতই ইহার একমাত্র সম্বন্ধ ছিল. কিন্তু যখন সে হুজুগের আর লেশাভাসও নাই, সে বক্তৃতার উত্তেজনা নাই, তথাপি অটুট অটল প্রভাবে এদেশে স্বদেশী দিন দিন সম্পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।—ইহার কারণ কি? ইহার প্রধানতম কারণ এই যে, স্বদেশী শুভ সময়ে সমাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এখন সমাজের সহিত

স্বদেশী একীভূত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। আর কয়েকদিন পরে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার একেবারেই এদেশে স্বাভাবিকী প্রথারূপে গণ্য হইবে।

স্বদেশীকে স্বাভাবিকী প্রথায় সত্বরে পরিণত করিতে হইলে, এ সম্বন্ধে এখনও কতকগুলি সাধনার প্রয়োজন। সে সাধনার প্রথম ও প্রধান বিষয় —অনুরাগ। বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের প্রতি বিদ্বেষজনিত ভাববিশেষ দ্বারা সমাজে স্বদেশীর প্রভাব পাইতে পারে। কিন্তু বিদ্বেষজাত স্বদেশীর ভিত্তি দৃঢ় হইতে পারে না। লর্ড কর্জ্জনের বা তাদৃশ শাসন কর্ত্তাদের ব্যবহার বিশেষে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে ইহা সত্য, তাহার প্রতিশোধার্থ আমরা বিদেশীয় দ্রব্য "বয়কট" করিতে পারি; ফলতঃ উহা হইতেই বয়-কটের উৎপত্তি। ইহাও স্বীকার্য্য যে এই বয়কটের দ্বারা স্বদেশীর যথেষ্ট উন্নতিও সাধিত হইয়াছে। ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে "বয়কট" ছাড়িয়া দিলে স্বদেশীর উন্নতিতে যথেষ্ট হানি হইবে, এমন কি স্বদেশীর ভিত্তি পর্য্যন্তও উহাতে বিকম্পিত হইয়া উঠিতে পারে, সুতরাং বয়কট যে স্বদেশীর এক প্রধানতম রক্ষক, তাহা সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার্য্য।

অনেকেই মনে করেন—বয়কট করিতে হইলে লোকের সহিত মারামারি করিতে হইবে। যাঁহারা এরূপ মনে করেন—তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত; নিজে বিদেশী দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিব, নিজে উন্নতির জন্য মনে প্রাণে কার্য্য করিব। ইহার সহিত রাজদ্রোহ বা মারামারি কোথায়? ইহা অন্তরের অনুরাগ মাত্র।

কিন্তু আসল কথা এই যে স্বদেশী যখন অনুরাগমূলক হইয়া দাঁড়াইবে, তখন বয়কটের প্রয়োজন হইবে না। মাতা যে স্বকীয় সন্তানের পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত যত্ন করেন, অহর্নিশি সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্যাকুল থাকেন, তাহার মূলে বয়কট সাধিকাবৃত্তি নাই, অথচ সন্তানের জীবন রক্ষা ও তাহার পুষ্টিসাধনে মাতার হৃদয়নিহিত প্রগাঢ় অনুরাগই উহার শ্রেষ্ঠ সাধন। স্বদেশী যখন সামাজিক নিয়মের সহিত সম্যক্‌রূপে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইবে, তখনও বয়কটের প্রয়োজন হইবে না। তদবস্থায় বিদেশীয় বস্ত্রাদি সুন্দরতর হউক, সুলভতর হউক, অথবা দীর্ঘতর কালস্থায়ী হউক, এদেশবাসীরা স্বদেশী বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে বিদেশীয় বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে না, সেরূপ কার্য্য করিতে গেলেও তাহাদের মনে ঘৃণা বা পাপের ভয় উদিত হইবে। যদি সামাজিক নিয়মের সহিত একবার স্বদেশী বিমিশ্রিত হইয়া যায়, তবে

বিদেশীয় লোকদের কোন প্রকার প্রলোভন বা কোন প্রকার শাসনেই এদেশবাসীর হৃদয় হইতে স্বদেশী উন্মূলিত হইবে না ইহা দৃঢ় নিশ্চয়। স্বদেশী আমাদের নিজস্ব ও উন্নতির মূল কারণ, ইহাতে রাজদ্রোহের কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই।

এবিষয় আমরা মফঃস্বল হইতে মধ্যে মধ্যে এসম্বন্ধে যে সকল সংবাদ পাইতেছি তাহাতে আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে স্বদেশী এখন ধীরে ধীরে সামাজিকতায় মিশিতেছে। আমারা মনে করিতাম স্বদেশী এই প্রকার প্রভাব ও প্রাদুর্ভাব কেবল পূর্ব্ববঙ্গেই অনুভূত হইতেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি মহকুমাতেই যে স্বদেশী সামাজিকতায় মিলিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া উঠিতেছে আমরা এ সম্বন্ধে অনেকগুলি সন্তোষ-জনক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতই সুখী হইতেছি। যাহাতে "স্বদেশী" ব্যাপার অনুরাগ ও সামাজিক ব্যবহারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, প্রত্যেক স্থানের নেতৃবর্গ বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও সুবিধান করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

(হিতবাদী হইতে উদ্ধৃত।)

একাদশ বর্ষ] পৌষ ১৩১৪। [৯ম সংখ্যা।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

REGD. NO. C. 116

BENGAL LIBRARY
10 JUL 1909
WRITERS' BUILDINGS.

সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী শ্রীবসন্ত কুমার কাবতীর্থ, শ্রীমহম্মদ মোজামল হক। ভোলা। শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক।

শ্রীঅমৃত লাল কুণ্ডু
ম্যানেজার—আলোচনা সমিতি,
১০৮, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

Printed and published by **Nafar Chandra Dutta**,
Printed at **The Salkia Printing Works**, *Kaldanga Lane, Salkia, Howrah*
and published at 108 Punchanantola Road, Howrah.

কবিরাজ শ্রীসতীশ চন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণের

আয়ুর্ব্বেদ জলধি মথিত

সোমেশ্বর রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, গ্রহণী, অরুচি, হৃদরোগ, শ্বাসকাস,
ক্ষয়কাস, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণজ্বর, ধাতুক্ষয়

প্রভৃতি

পুরাতন জটিল রোগের একমাত্র মহৌষধ।

(যজ্জ্বরা ব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজম্ তদ্রসায়নম্।)

যাহা সেবন করিলে সকল রোগের বিনাশ হয়, তাহাকেই রসায়ন বলে।

অম্লপিত্ত শূলরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ! এই "সোমেশ্বর রসায়ন" সেবন করুন। সেবনের পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, ঢোঁয়াঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা প্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গ নিবারণ হইবে। ১৫ দিন সেবন করিলে উৎকট ব্যাধি অম্লরোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। আহারান্তে যাহাদের পেটে ভাত থাকে না, তাহারা ২।৩ মাত্রা ঔষধ সেবন করিয়াই আশ্চর্য্য ফল অনুভব করিবেন; দেখিবেন, পরদিন বমনের উদ্রেক পর্য্যন্ত হইবে না। শরীর দুর্ব্বল না থাকিয়া সবল হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ বা দমকা মল নিবারণ হইবে। অম্লজনিত হৃদরোগ যথা—বুক ধুড়ধুড় করা, বুক ধড়ফড় করা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি আরাম হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে—সেবন করুন, জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে অগ্নিমান্দ্য দূরে যাইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

সহজ শরীরে সেবন করুন—ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, শরীর আরও মোটা হইবে, গায়ের বল আরও বৃদ্ধি পাইবে, দুশ্চিন্তা দূর হইয়া মনে স্ফূর্ত্তি পাইবেন।

৪ আউন্স এক শিশি ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৶০ আনা। ৩ শিশি ২৸০ আনা, মাশুলাদি ॥৶০ আনা। ৮ আউন্স এক শিশি ১৸০ আনা, মাশুলাদি ।০ আনা। ৩ শিশি ৫৲ টাকা, মাশুলাদি ১৲ টাকা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

৪ নং নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীহরি চরণ ঘোষ প্রণীত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সঞ্জয় কহিল শুন অন্ধ মহারাজ
কৌরব পাণ্ডব মিলি কি করিছে কাজ;
পাণ্ডবের ব্যূহ দেখি রাজা দুর্য্যোধন
আচার্য্য নিকটে গিয়া কহিল বচন।
শরীরের পঞ্চস্থান পাণ্ডবে প্রকাশ
ক্ষিতি অপ তেজঃ আর মরুত আকাশ;
যোগরূপ মহাহবে এরা পঞ্চ রথী
আর সেই ভগবান শরীর-সারথি,
যোগের সাধন হেতু দেখি সমাবেশ
প্রবৃত্তির পক্ষে ভয় হইল বিশেষ;
এ পক্ষের নেতা সেই রাজা দুর্য্যোধন
চির সমস্কার দ্রোণে কহিছে বচন,
যে ইন্দ্রিয় এত সুখ দিল এত কাল
তাহারে নাশিয়া কেন বাড়ান জঞ্জাল। ২
ব্যূহ বাঁধে পাণ্ডুসেনা করিয়া বিস্তার
ধীমান দ্রুপদসূত অধিনেতা তার,
অন্তরয মিনী শক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নে কয়,
যার বলে ভাল মন্দ অনুভব হয়;

বায়ু অগ্নি সম সব মহাপ্রাণ বীর—
বিরাট দ্রুপদ আর যুযুধান ধীর
ধৃষ্টকেতু কাশীরাজ আর চেকিতান
পুরুজিত কুন্তিভোজ শৈব্য বীর্য্যবান্
যুধামন্যু উত্তমৌজা বিক্রান্ত সুপ্রাণ
সুভদ্রা—দ্রৌপদী-সূত সবে আগুয়ান্ ;
পূরব বর্ণন নহে শুদ্ধ নামাবলি
ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব প্রকাশে সকলি ;
নানারূপে নানাভাব যোগেতে বিকাশে।
পূরব সঙ্কেত তার কতক প্রকাশে। ৩-৬
আমাদের দলে যারা নেতা বীর্য্যবান্
সবিশেষ বলি গুরু কর অবধান ;
ভীষ্ম কর্ণ কৃপ আর সসত ভবান্
বিকরণ সৌমদত্তি মহা বীর্য্যবান্
যুদ্ধ-বিশারদ আর অন্য বহুবীর
রাজি আছে মম কাজে ত্যজিতে শরীর ;
ভীষ্ম রক্ষা করে মোর সেনানী অসীম ;
সসীম পাণ্ডব সেনা রক্ষা করে ভীম ;
দলবলে একা ভীষ্ম রাখিবে কৌশলে
ভীষ্মে রক্ষা কর গুরু আপনা সকলে। ৭-১১
শান্তনু-তনয় হেথা হেন অবসরে
কাঁপাইয়া দিগ্‌মণ্ডল শঙ্খ-নাদ করে। ১২
তুরী-ভেরী-আদি পরে বাজে বাদ্যকুল,
ডুবাইয়া ভীষ্ম-শঙ্খে হইল তুমুল। ১৩
শ্বেত-হয়-যুক্ত এক মহত্ স্যন্দন
মাধব পাণ্ডব চাপি দিল দরশন ;
উভয়ে বাজায় শঙ্খ উচ্চরব করি

দেবদত্ত ধনঞ্জয়, পাঞ্চজন্য হরি ;
পৌণ্ড্র নামা মহাশঙ্খ বৃকোদর বীর
অনন্ত বিজয় শঙ্খ রাজা যুধিষ্ঠির ;
মণিপুষ্প সহদেব, সুঘোষ নকুল
শঙ্খরবে দশদিশি হইল আকুল। ১৪-১৬
শিখণ্ডী সাত্যকি আর কাশীনরপতি
বিরাট দ্রুপদসূত দ্রুপদ সুমতি
দ্রৌপদী-সুভদ্রা-সূত আর বীরকুল
এক এক শঙ্খ লয়ে নাদিল তুমুল। ১৭-১৮
আকাশ পৃথিবী যুড়ি মহারোল করে,
নাদ শুনি কুরুদের হৃদয় বিদরে। ১৯
ধৃতরাষ্ট্র শত-সূত বদ্ধপরিকরে
অর্জ্জুনে মারিতে সবে শস্ত্র-পাত করে ;
তাহা দেখি কৃপা করি অর্জ্জুন সুজন
হৃষিকেশে সম্বোধিয়া কহিল বচন। ২০
রথ রাখ হৃষিকেশ দুই-দল-মাঝে
দেখে লই যুঝিবারে কেবা কেবা সাজে। ২২
দুরবুদ্ধি-দুর্য্যোধন-প্রিয়-সম্পাদনে
কোন কোন বীর দেখি আসিয়াছে রণে। ২৩
অর্জ্জুন-বচন শুনি প্রভু হৃষিকেশ
সৈন্যদল-মাঝে রথ করি সমাবেশ
পার্থে সম্বোধিয়া তবে কন্ ভগবান্
এই দেখ কুরু সব রণে আগুয়ান। ২৪-২৫
আসিয়াছে নরপতি গণা নাহি যায়
সবাকার আগে দেখ ভীষ্ম দ্রোণ যায় ;
নিরখিয়া দু-পক্ষের পুরুষনিচয়
মোহ-বশে অর্জ্জুনের ব্যথিল হৃদয়।

দেখিল স্বজন সব রণে উপনীত
তাহাদের সঙ্গে রণ না হয় উচিত ;
পিতৃ-পিতামহ সখা আচার্য্য-ঠাকুর
ভ্রাতা পুত্র পৌত্র আর সুহৃদ শ্বশুর ;
কেমনে করিবে রণ ইহাদের সনে
বিষম বিষাদ জাগে অর্জ্জুনের মনে। ২৬-২৭
কহিল বচন তবে কৃষ্ণে সম্বোধিয়া
স্বজন-সমরে মোর নাহি লাগে হিয়া ;
গাত্রে ঝরে স্বেদবারি শুকায় বদন,
কাঁপে অঙ্গ মুহুঃ হয় রোম হরষণ,
গাণ্ডীব খসিছে হাতে দহিছে শরীর,
আসনে বসিতে নারি মানস অধীর ;
চারিধারে দুর্নিমিত্ত হেরি অনুক্ষণ
না জানি কি অমঙ্গল হইবে ঘটন। ২৮-৩০
কি জানি কি ভাল হ'বে মারিয়া স্বজন,
চাহি না বিজয়-সুখ কিম্বা রাজ্যধন,
ভোগসুখে প্রাণে আর রাজত্বে কি করে
যাহাদের তরে সব তারা যদি মরে। ৩১-৩২
ধনপ্রাণ ত্যজি তারা রণে উপনীত,
জ্ঞাতি বধিবারে মোর নাহি লাগে চিত ;
পিতৃ-পিতামহ আদি আপনার জন
বধিবার চেয়ে ভাল নিজের মরণ,
পাই যদি ত্রিভুবন পৃথিবী কি ছার
তথাপি না বিনাশিব জ্ঞাতি আপনার ;
সবন্ধু কৌরব বধি মহাপাপ হবে
স্বজনে মারিয়া সুখী কে কোথায় কবে। ৩৩-৩৬
কুলক্ষয়ে মিত্রবধে মহাদোষ পায়,

মোহান্ধ কৌরব তাহা দেখিতে না পায় ;
জানি শুনি মহাপাপ কেমনে বা করি
আজ্ঞা কর জনার্দ্দন রণ পরিহরি ;
কুল-ধর্ম্ম নষ্ট হয় যদি কুল-ক্ষয়,
ধর্ম্ম নাশে হয় প্রভু অধর্ম্ম-উদয় ;
অধর্ম্ম-উদয়-হেতু নষ্টা কুল নারী
বরণ-সঙ্কর তায় জন্মে দুরাচারী ;
বরণ-সঙ্কর টানে নিরয়-নিবাসে
অধোগামী পিতৃগণে, পিণ্ডোদক নাশে।
এই সব দোষ প্রভু ঘটে যেই কুলে
জাতি-কুল-ধর্ম্ম তার বিনষ্ট সমূলে ;
কুল-ধর্ম্ম নষ্ট যার, শুনি ভগবান্
নরকে নিবাস তার শাস্ত্রের বিধান।
রাজ্যলোভে রাজি আমি জ্ঞাতি বধিবারে,
আমা হতে পাপী আর কে আছে সংসারে ;
কৌরবের বাণে যদি ত্যজি পাপপ্রাণ
তবে হয় প্রায়শ্চিত্ত উচিত-বিধান ;
এত বলি ধনঞ্জয় করি মনস্তাপ
বসিল বিষণ্ণভাবে ত্যজি শরচাপ। ৩৭-৪৬
ব্রহ্মবিদ্যা যোগশাস্ত্র মুক্তির কারণ,
শিখাইল পার্থে যথা নিজে নারায়ণ,
তাহা লয়ে ব্যাস-ঋষি রচিল সংহিতা,
মুক্তি-কল্পতরু এই ভগবতগীতা।
অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ প্রথম অধ্যায়
শ্রীগুরু-আজ্ঞায় হরি গাইল ভাষায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্ধ মহারাজে তবে কহিল সঞ্জয়
রথোপরে মৌনভাবে ভাবে ধনঞ্জয় ;
বিষম বিষাদ-মেঘ মানসে উদয়
গণ্ড ভিজাইয়া অশ্রু দরদরে বয় ;
বহু কাল প্রচলিত প্রবল অভ্যাস
সাধকে না পারে আশু করিতে বিনাশ, ;
যোগধর্ম্ম করি কিম্বা করি লোকাচার
কভু কভু দেখে মনে করিয়া বিচার ;
কত সুখ দিল মোরে ইন্দ্রিয় সকলে
পরিণামে তাহাদের মারিব কি বলে ;
অনিশ্চিত যোগ যাহে ফল-আশা নাই ;
আশা করা রোগ মোর কেমনে এড়াই।
এ রোগে ঔষধ সেই শ্রীগুরু-চরণ
সে কেবল মুক্ত হয় যে লয় শরণ।
উত্তরিল হৃষিকেশ শুনহে সুমতি
হেন কার্য্যে কেন তব হইল বিরতি,
হেন হীন ভাব ধরে অনার্য্য বর্ব্বর
ধার্ম্মিকের পক্ষে ইহা নহে কীর্ত্তিকর। ১-২
এ হেন ক্লীবতা পার্থ তোমা নাহি সাজে
দুর্ব্বল হৃদয় ধরি লাগ নিজ কাজে,

ইন্দ্রিয় দমিতে যদি এতই বিরতি
তবে কেন মাঝে মাঝে ধর্ম্মে কর মতি। ৩
অর্জ্জুন কহিল শুন শ্রীমধুসূদন
ভয়-সংস্কার ত্যজি নাহি সরে মন। ৪
ইহাদের বাঁচাইয়া খাব ভিক্ষা করি,
যোগ করি সুখ-লাভ আশা ভয়ঙ্করী ;
পরাজয়ে মারে কুরু, জয়ে শোকানল,
হারি কিম্বা জিতি প্রভু সম হবে ফল ;
ইন্দ্রিয় রাখিলে আমি পাব বটে পাপ
ভয় হয় পাছে মোর হয় অনুতাপ ;
পিতৃগণ যেই ধর্ম্ম আচরিল আগে
সে ধর্ম্ম ত্যজিতে মোর ভাল নাহি লাগে ;
সর্ব্ব কার্য্যে ফল-আশা বড়ই কৃপণ
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি বুঝে মূঢ় মোর মন ;

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিদাস ঘোষ।

---

* লোকচরিত্র বিচার।

কোনও ব্যক্তিরই দোষগুণের বিচার ক্ষিপ্রভাবে হওয়া সঙ্গত নহে। ক্ষিপ্রবিচারদ্বারা অধিকাংশ সময় যথার্থ ঘটনা আবিষ্কৃত হয় না। যে বিচার কর্ত্তা, সে যদি বিচার্য্য বিষয়টী তলাইয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সচেষ্ট না হইয়া ক্ষিপ্র বিচার করিয়া ভ্রম প্রমাদে নিপতিত হয়, তাহাহইলে সে অন্যায় ভাবে পরিচালিত হইয়া সর্ব্বনাশকর বিপদ ছায়া আলিঙ্গন করিতে পারে তদ্রূপ যাহাকে দোষী সাব্যস্ত, করা হয়, দোষগুণের যথাযথ মীমাংসা না হওয়ায় সমাজে তাহারও প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে।

* এই প্রবন্ধটী ১৯০৬ সালের তরা এপ্রিল লেখকের দেশস্থ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পঠিত হয়। ইহার ভাব ইংরাজী প্রবন্ধ পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

আমরা যদি ভ্রম বশতঃ কোনও ব্যক্তির চরিত্রে দোষার্পণ করি, এবং সেই দোষের কথা যদি চতুর্দ্দিকবিকীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শেষে চেষ্টা করিয়াও সে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারি না। যে হেতু আমরাই ঐ দোষ ঘোষণা করার মূল বলিয়া আমাদিগকেই উহার সাক্ষ্যস্বরূপ দাঁড়াইতে হয়।

কোনও লোক চরিত্রের দুর্ব্বোধ্য অংশ ন্যায্যভাবে বর্ণনা করা সহজ জ্ঞানের কর্ম্ম নহে, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু স্বীকার করিয়াও একজন লোক, তাহার প্রতিবেশী সম্বন্ধে অনায়াসে একটা অনুমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হয়েন। অথচ একটা পুষ্প কি একগাছা তৃণ কি উপাদানে গঠিত, তাহা আবিষ্কার করিতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। আমরা অকিঞ্চিৎকর একগাছি তৃণের, যাহা সগর্ব্বে পদদলিত করিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বদাই সূচনা করিয়া থাকি উপাদান ঠিক করিতে পারি না, আর ভগবানের একটা রহস্যময় সৃষ্টজীব মনুষ্যচরিত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যদৃচ্ছাক্রমে অনাবশ্যক স্থলে দুই একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফেলি, ইহার অপেক্ষা মূঢ়তার ও সংকীর্ণতার বিষয় কি থাকিতে পারে?

সম্ভবতঃ যাঁহারা একটু জ্ঞানজ্যোতি হৃদয়ে দীপ্ত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কোনও ব্যক্তির দোষগুণ আলোচনা করার পূর্ব্বে বিশ্বাসী লোকের নিকট হইতে ঐ ব্যক্তিসম্বন্ধে কিছু পরিজ্ঞাত হয়েন ও তাহার কথাতেই নির্ভর করিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইতর ও জ্ঞানীর মধ্যে তখন এই পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে, ইতর লোক মানবচরিত্র সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করার সময়, উহার দায়িত্ব বিবেচনা না করিয়া নিতান্ত অসার পরিত্যাজ্য অব্যবহার্য্য জিনিস পত্রের ন্যায় মানব চরিত্রটী মনে করিয়া একটা যদৃচ্ছা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন, আর জ্ঞানীগণ সে স্থলে মানব চরিত্রটীর সমালোচনা একেবারে পথের রজঃকণা কিংবা পদ-নিষ্পীড়িত তৃণাদির ন্যায় অসার মনে না করিয়া বিষয়টী আলোচনার যোগ্য মনে করিয়া থাকেন ও কেবল ইতর লোক কি অবিশ্বাসী লোকের নিকট হইতে মানব চরিত্র সম্বন্ধে কিছু শুনিয়া তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করেন না। অথবা তাহাদের কথানুযায়ী কোনও বিষয়ের কোনওরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে চাহেন না।

বিশ্বাসী লোকের নিকট হইতে কোনও বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপনও নিন্দার্হ। পরের এইরূপ হালকা কথায়, অথবা উহা নিজের কথার ন্যায় প্রতীয়মান করিয়া প্রকাশ করায়, তত্দূর ক্ষতি সংসাধিত না হইতে পারে; কিন্তু যে স্থলে আমরা অনুদার বিচারকের বিচার সমর্থন করার সামান্য মাত্র ভিত্তি পাইয়া উহার প্রচারে সাহায্য করি, সে স্থলে আমাদের কতদূর লজ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য।

যদি আমাদের ঐ হালকা কথা বিশ্বাস করার প্রচুর কারণও থাকে, এবং তজ্জন্য উহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে উৎসাহী হই, তথাপিও উহা সাধারণের সম্মুখে ব্যগ্রভাবে নিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। যে কথাগুলি নিন্দনীয় ও পাপপূর্ণ সে কথাগুলি সমাজে অপ্রকাশ থাকাই কর্ত্তব্য।

মানবের কার্য্যে ও ব্যবহারে অনেক সময় তাহাদের দোষ গুণের বিকাশ হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি ধীর, সংযমী, চিন্তাশীল, ও পরোপকারী তাহাকে কিছুকাল সম্মুখে রাখিয়া তাহার কার্য্য প্রত্যক্ষ করিলে যেমন তাহার অন্তর খানি অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তেমনই যে ক্রোধী, ব্যসনানুরক্ত ও অমিতব্যয়ী, তাহার বিষয় ঐরূপ কোনও উপায় অবলম্বনদ্বারা পরিচিত হওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কতকগুলি লোকের পক্ষে ঐরূপ উপায় উপযোগী নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে একজন কমিশনারের নাম উল্লেখ কর, তাহার আদেশ গুলিই তাহার দোষ গুণের পরিচায়ক। উহা যদ্রূপ সাধারণ লোকই ভোগ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সাধারণ লোকের অভিমতই তাহার উপযুক্ত ও অনুপযুক্ততার নিদর্শন। আমরাও উহাদের বিষয় কিছু বলিতে হইলে সাধারণ লোকের মন্তব্যই প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু জনরবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐরূপ সকল লোকের চরিত্র বিচার করা উচিত নহে।

তুমি যদি জনরবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একটা মত দাঁড় করাইতে চাহ, তাহা হইলে উহা দ্বারা অনেক সময় কতকগুলি জনতার সৃষ্টি হইবে মাত্র। জনরবের উপর নির্ভর করিয়া এপর্য্যন্ত অনেকেই লোক চরিত্র সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

যদি সাধারণ লোক কোনও অংশ ন্যায্য ভাবে অথবা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করেন, এবং তাহা হইতে যদি নিরপেক্ষ বিচারক যথার্থ তত্ত্বে পহুছিতে পারেন, তাহা হইলে জনরব বা চলিত প্রসঙ্গ অনেকটা উপকারী। জনরব

অনেক সময় যে খাঁটি হয় তাহাও আমরা স্বীকার করি, কিন্তু উহা অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইলে, মানবের হৃদয়ে একটা অযথার্থ ভাব আনিয়া দিতে পারে।

আমরা সাধারণ তত্ত্ব ৩টী কি ৪টী বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া মানব চরিত্র বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি।

প্রথমতঃ মহৎ লোক কর্ত্তৃক কোনও চরিত্র বর্ণিত হইলে তাহা খাঁটি ও নির্দ্দোষ মনে করিয়া থাকি, আর ইতর লোকের বর্ণনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্ত হই না। কিন্তু ঐরূপ ধারণাও অমূলক। আমরা যদি মহৎ লোকের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, তাহাদের মন্তব্য সরল ও ভাবপূর্ণ হইলেও অনেক সময় মিথ্যা সমাচার বা ভুলপূর্ণ যুক্তিদ্বারা স্থিরীকৃত।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্ব সংস্কার বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে অনেকের চরিত্র বর্ণনা করিয়া থাকেন, আমরা অনেক সময় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অযথার্থ উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

তৃতীয়তঃ বিবেচ্য বিষয় জ্ঞানহীন—সংবাদ বহনে অসমর্থ—ব্যক্তির প্রমুখাৎ কোনও লোকের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু শুনিয়া তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকি।

কখনও কখনও এই সমস্ত কারণ একত্র মিশ্রিত হইয়া ফল এত বিষম করে যে, কোনও লোকের চরিত্র পক্ষপাতকারী বিচারকের দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়া বিচার্য্য বিষয়টী অন্যায়ভাবে প্রচারিত হয়।

মনুষ্যের সুনাম ও দুর্নাম অনেক সময় নীম শ্রেণীস্থ লোক দ্বারা ঘোষিত হইয়া থাকে, উহারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া তিলকে তাল করিয়া প্রকাশ করে।

কোনও বিষয়ের যথার্থতা সাধারণের নিকট প্রকাশ করার ক্ষমতা সুযোগ ও অভিলাষ অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। কোনও কার্য্যে দোষ অর্পণ করার পূর্ব্বে সেই কার্য্যটী ধীরভাবে হৃদয়ঙ্গম ও উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

যে কার্য্যে তুমি দোষ দিতেছ সেই কার্য্যটী সম্বন্ধে কার্য্যকারকের জ্ঞান ও মতের, অথবা উহার গুরুত্ব তিনি প্রকাশ না করিয়া হৃদয় মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে পারেন, তুমি হয়ত তাহার বিষয় কিছু জানিতে পারিতেছ না।

অথচ একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিন্দনীয় করিতেছ? এসব বিষয় চিন্তা না করিয়া বিচারকের কোনও কথা বলা উচিত নহে, এখনও দেখা যায় যে, বিচারক উহা তলাইয়া বুঝিতে না পারিয়া যাহা তিনি অন্যায় বলিয়া প্রচার করিতেন তাহাই যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

একটী সামান্য কার্য্য দ্বারা হয়ত একটী লোকের জীবনের গতি স্থির করা যায়, আর একখানি জীবন চরিত পাঠ করিয়াও জীবিত কিংবা মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু ঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় না। যে সামান্য কার্য্য করে সে উহা সম্পাদনের জন্য প্রশংসিত হওয়ার আশা করে না, কাজেই তাহার সে কার্য্যটী অনেক সময় খাঁটি ও আন্তরিক বলিয়া বোধ হয়। আর যাহার জীবন চরিত পাঠ করিয়াছি তাহার কার্য্যগুলি হয়ত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অতিরঞ্জিত হইয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অথবা তাহার হৃদয়ের ছায়া উহাতে প্রতিফলিত হয় নাই। কাজেই জীবন চরিত পাঠ করিয়া তাহার সম্বন্ধে যে টুকু জানা সম্ভব, তদপেক্ষা তাহার সঙ্গে কয়েকটী কথা বলিয়া তাহার বিষয় বেশী জানা অনেক সময় সম্ভব হইয়া পড়ে।

আমরা কোনও লোকের একটী মহৎ কার্য্য দেখিয়াই তদ্দ্বারা তাহার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোনও একটা মত প্রকাশ করিতে পারি না। পূর্ব্বে দেখা উচিত, সেই মহৎ কার্য্যটী সম্পাদনে যে সহায়, বল ও মানসিক শক্তির দরকার, তাহা তাহার মধ্যে আছে কি না? যদি না থাকে তাহা হইলে বুঝিব, সেই কার্য্যটী অন্যের সহায়তায় বা দৈবাৎ সম্পাদিত হইয়াছে।

মানুষ যদি তাহার প্রকৃতি, কার্য্যপ্রণালী, ও চরিত্র সাধারণকে বুঝিতে না দেয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে মিলন বড়ই কষ্টকর হয়। এই জন্য যে চরিত্র দুর্ব্বোধ্য, জটিল, তদপেক্ষা যে চরিত্র সরল ও সুস্পষ্ট সেই চরিত্রই আদরণীয়।

অনেকে Reserve character বা অস্পষ্ট চরিত্র ভাল বাসেন। কেহ কেহ বা ঐ চরিত্র গভীর গুণসম্পন্ন মনে করিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আমরা সে চরিত্র বিশেষ পছন্দ করি না। কারণ, ঐরূপ চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা সাধারণের কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হয় না। যাহারা অদীর্ঘদর্শী লোক, তাহারাও উহার মনের ভাব বুঝিয়া সব সময় কার্য্য করিতে পারে না। কাজেই অনেক স্থলে ঐরূপ লোকের হস্তে যে সব কার্য্যের ভার অর্পিত হয়, তাহা সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না।

এখন দেখা যাউক, কাহারও চরিত্র বিচার করার পূর্ব্বে, কোন্ কোন্ বিষয় লক্ষ রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ যাহার চরিত্র সমালোচনা করিবে তাহার বুদ্ধিতে প্রতিভা, তীক্ষ্ণতা, ও যুক্তি-কারিতা গুণ আছে কি না? দ্বিতীয়তঃ তাহার বিচার শক্তি ও জ্ঞানগভীরতা কিরূপ, যদিও এই দুইটী বিষয় পরীক্ষা করা অতিশয় ক্লেশকর, কারণ উহারা বুদ্ধি ও বিবেক জ্ঞানের মিশ্রণ জনিত ফল মাত্র। তথাপিও যত দূর সম্ভব ঐ সব সারতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এতদ্ভিন্ন অন্তর্জ্জগতের কতকগুলি দোষগুণ ও বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যথা স্বার্থপরতা, আত্মাভিমান, অতিবাদ প্রিয়তা, স্বভাব, প্রবৃত্তি ও অনুকরণশক্তি, উপরোক্ত দোষগুণ গুলি জানিয়া কাহারও চরিত্র সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত কিংবা সাহসী হওয়া অন্যায় নহে, কিন্তু যাহারা না জানিয়া, কিংবা জানার উপায় স্থির করিতে না পারিয়া কোনও লোকের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলেন, তাহাদের দ্বারা উপকারের ত আশাই নাই, বরং অপকারেরই সম্ভব অধিক। এইরূপ কার্য্যজ্ঞানহীন বিবেচক, সমাজের, দেশের, ও সর্ব্বসাধারণের যে ঘৃণার পাত্র তাহা বোধ হয় আর বিস্তারিত রূপে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

উন্মত্ত।

যাকে মাঝে যখন নদীতটে বেড়াইতে যাইতাম একটী লোক সর্ব্বদা আমার নয়নপথে পতিত হইত। লোকটী যুবক; পরিধানে ছিন্নবস্ত্র; দেখিলেই বোধ হইত যেন সে উন্মত্ত। লোকটী একমনে বসিয়া থাকিত; কাহারও সহিত সে কথা কহিত না; কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না আমি কিন্তু যখন তাহাকে দেখিতাম, আমার বোধ হইত সে নীচবংশ সম্ভূত নহে,

কালের একটা মর্ম্মঘাতিনী লীলা সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্ব্বল মানব এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

একদিন কৌতূহল পরবশ হইয়া তাহাকে ডাকিলাম। সে নিকটে আসিল কিন্তু এমন ভাবভঙ্গী করিতে লাগিল যে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না যে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত। আমি তাহাকে গৃহে লইয়া চলিলাম। দুই তিন ঘণ্টা পরে তাহাকে আহার করিতে দিলাম। অহারান্তে সে কথা কহিল। আমি উৎসুক হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম। সে কহিল, "মহাশয়! আপনাকে কতকগুলি কথা বলিব। বাস্তবিক আমার মস্তিষ্ক বিকৃত; তবে সময়ে সময়ে আমি প্রকৃতিস্থ হই, আমার পূর্ব্বজ্ঞান আবার ফিরিয়া আসে; কিন্তু মহাশয়! জ্ঞান বড় কষ্টদায়ক; অজ্ঞানের দুঃখ নাই।" আমি কহিলাম—"আপনার এত দুঃখ কেন?" লোকটী কহিল "সব বলিতেছি শুনুন, আমি ভদ্র সন্তান—জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাটী সপ্তগ্রামে আমার পিতার মৃত্যুর পর স্ত্রী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। আমি তখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম। পিতা জীবদ্দশায় আমার বিবাহ দিয়াছিলেন; পত্নীকে গৃহে রাখিয়া আমি কলিকাতায় থাকিতাম। পাছে আমি পত্নীর চিন্তায় লেখা পড়ায় অন্যমনস্ক হই, পাছে আমি অসার চিন্তায় জীবনের সারকর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হই, এই ভয়ে আমি সর্ব্বদা আপনার উপর প্রভুত্ব দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতাম। জানি না ইহার ফলই বুঝি বিষময় হইয়া উঠিল।

কলেজে অনেক পুস্তকে পূত প্রণয়ের অনেক উদাহরণ পাইতাম। বিরহ-মলিনা শকুন্তলা, সাধ্বী সীতা, অনন্যহৃদয়া দময়ন্তী, পতিপ্রাণা জুলিয়েট্ প্রভৃতির চিত্র আমার অন্তরে প্রতিফলিত হইয়া আমাকে একটা আকাঙ্ক্ষার পানে সবলে ধাবিত করিত; সেইজন্য মাঝে মাঝে পাঠাভ্যাসের পর আমি ক্ষণকালের কল্পনার বশীভূত হইয়া, আমার সহিত আমার পত্নীর কিরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত, তাহা চিন্তা করিতাম।

মাঝে মাঝে আমি যখন গৃহে যাইতাম, তখন কল্পনা করিতাম কি অবস্থায় পত্নীকে দেখিব। কখন মনে করিতাম হয় ত তাহাকে শরীরিণী বিরহব্যথা অথবা প্রাচীমূললগ্নশশিকলার ন্যায় দেখিব। হয়ত দেখিব পত্নী নিয়মক্ষামমুখী ঘূতৈকবাণী।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিতাম। প্রবেশ করিয়া কার্য্যান্তরপর অবগুণ্ঠনবতী পত্নীকে যখন দেখিতাম তখন আমার কল্পনারাশি বাত্যাহত তাসপুঞ্জের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বিলীন

হইয়া যাইত। আমি মনে করিতাম কল্পনা ও সত্যে বিশেষ প্রভেদ।

যখন স্ত্রীর সহিত দেখা হইত তখন সে আমার বিচ্ছেদে কষ্ট অনুভব করিত একথা শুনিতে পাইতাম না এমন নহে, কিন্তু আমার নিকট তাহা সত্য বলিয়া বোধ হইত কিনা বলিতে পারি না; কারণ সে বিষয় লইয়া আমার মনে সময়ে সময়ে তর্ক উঠিত। আমি পত্নীর মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। অনেক ঘটনা একীকৃত করিয়া অনুমান করিতে চেষ্টা করিতাম যথার্থ সে আমার প্রতি অনুরক্ত কি না—যথার্থ তাহার সুখদুঃখ আমার উপর নির্ভর করে কি না। একদিন হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহাকে বলিয়া ফেলিলাম "আমি না থাকিলে তোমার দুঃখ হয় কি?" আশা করিয়াছিলাম পত্নী প্রত্যুত্তরে অনেক প্রাণস্পর্শী কথা কহিবে। কিন্তু আশা বিফল। সে আমার কথার উত্তর দিল না। আমিও নীরব হইলাম।

পত্নী স্বল্পভাষিনী ছিল। বুঝি তাহার সমস্ত কথা অন্তরে লুকাইয়া থাকিত। বুঝি আমি তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতাম না। বাহিরে তাহার প্রণয়ের বিকাশ না দেখিয়া অনন্তদর্শী মূঢ়ের ন্যায় আমি কত কি কুটিল কল্পনার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে হাবুডুবু খাইতাম।

* * * * * *

পত্নীর সংসর্গে কয়েক দিন কাটিল। কোথায় সে প্রণয়—যাহা দম্পতীকে চিরকালের জন্য এক কঠিন সূত্রে আবদ্ধ করে;-কোথায় সে প্রেম—যাহা এক জনের জন্য জীবনেরও মূল্য লঘু করে, কোথায় সে ভালবাসা যাহা ইহজীবনের নরককেও স্বর্গ করিয়া তুলে, দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়া দেয়—আর পরজীবনেরও একটা অদম্য শক্তিতে পরিণত হইয়া অয়স্কান্ত সদৃশ প্রণয়পাত্রকে আকৃষ্ট করে। আমি পত্নীকে ভালবাসিতাম না এমত নহে। কিন্তু রূপজ-মোহ প্রবৃত্তি সুতরাং অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু পত্নী আমার কিরূপ ভাল বাসিত। তাহার নীরব হৃদয়ে প্রণয় কি মূর্ত্তিতে বিরাজ করিত তাহা আমি তখন ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

পত্নী, জানি না আমার মনোভাব বুঝিয়া বোধ হয় দুঃখিত হইত। তাহার কেবল মাত্র এই দুঃখ ছিল না। ভ্রাতৃজায়ার অসহ্য তাড়নে সর্ব্বদা তাহাকে ব্যথিত হইতে হইত। কিন্তু অপরের অসীমত্বেষে তাহার সে কষ্ট কম হইত না এমন নহে। ভ্রাতা, পত্নীকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

এই সময় হইতে আমার অপরিসীম কষ্টের সূত্রপাত হইল। সহসা অগ্রজের মৃত্যুতে আমি পৃথিবী শূন্য দেখিলাম। অর্থের অভাব ছিল না। সেই জন্য কোন একটা দারুণ উদ্বেগে পতিত হই নাই। তথাপি যেন অন্ধকার একটু একটু করিয়া স্বীয় কলেবর বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে ঘেরিতে লাগিল। আমি যেন তাহাতে ক্রমে ক্রমে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

বিধাতা একখানা জগত হইতে আর একটা জগতে আমাকে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বজগতের সমস্ত বিলীন হইল; কেবল কতকগুলি রহিয়া গেল মাত্র; আমি সেই স্মৃতিগুলি সযত্নে হৃদয়ে রাখিতাম, কারণ সেগুলি আমার দুঃখের সহচর ছিল। সেই কলেজের অধ্যয়ন, সেই পূর্ব্বজীবনের আনন্দ বড় মধুর বোধ হইত; পূর্ব্বজীবনের দুঃখগুলিও যেন সুখকর বলিয়া অনুভব করিতাম।

একে অগ্রজের শোক তাহার উপর ভ্রাতৃজায়ার কুব্যবহার তাহার উপর আবার প্রাণের একটী অশান্তি দিন দিন আমাকে উদাসীন করিয়া তুলিতে লাগিল। এই তিন দুঃখের কারণের মধ্যে ভ্রাতৃজায়ার কুব্যবহার বুঝি আমার চৈতন্য স্ফুরিত করিল। তাহার কারণ বলিতেছি শুনুন:—

মিতভাষিণী পত্নী ভ্রাতৃজায়ার দুর্ব্যবহারে ব্যথিতা হইত। আমি যখন আবার তাঁহার প্রকোপে পড়িতাম তখন পত্নীর জ্বালা কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিতাম, তখন আমার প্রাণে একটু করুণা, একটু সহানুভূতি জাগিয়া উঠিত, তখন আমি তাহাকে প্রকৃত ভাল বাসিতে পারিতাম। কিন্তু মূঢ় আমি! সে ভালবাসা আমার অন্তরে স্থায়ী হইত না; উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহা তিরোহিত হইয়া যাইত।

একদিন ভ্রাতৃজায়া হঠাৎ রোষ পরবশ হইয়া পত্নীকে আহার করিতে দিল না। আমিও সে দিন তাঁহার দ্বারা বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম। উপোসিতা পত্নীর কষ্ট আমাকে কিছু ব্যথিত করিল; আমি কিছু আহারীয় দ্রব্য লইয়া তাহাকে খাইতে দিলাম। পত্নী আমার এই ব্যবহার দেখিয়া চুপ করিল তারপর আমি দেখিলাম তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। আমি কহিলাম "লক্ষ্মী! তুমি কাঁদিতেছ কেন? ভ্রাতৃজায়ার দুর্ব্যবহারে তুমি কি এতই পীড়িত?" লক্ষ্মী উত্তর করিল না; অশ্রুবেগ প্রশমিত হইল না; নীরবে চক্ষু দিয়া তাহার অনর্গল অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। আমি

কহিলাম—"কাঁদিও না। ভ্রাতৃজায়ার দুর্ব্ব্যবহারে দুঃখ করিও না। চক্ষু মুছিয়া লক্ষ্মী কহিল--দুর্ব্ব্যবহারে আমার দুঃখ নাই।" লক্ষ্মী আবার নয়নজলে তাহার অঞ্চল অভিষিক্ত করিল। লোকটী এইখানে চুপ করিল। আমি বুঝিলাম তাহার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে। মনে করিলাম বলি মহাশয় একটু বিশ্রাম করুন। কিন্তু কথা উচ্চারিত না হইতেই লোকটা একটু উন্মত্তের মত বলিতে আরম্ভ করিল।

"দিদির দুর্ব্ব্যবহারে দুঃখ নাই। তবে এত অশ্রু কেন লক্ষ্মী আমার দুর্ব্ব্যবহারে কি? ভ্রাতৃজায়া অসহ্য বাক্যবাণে যে যাতনা দিতে পারে নাই আমি কি কোন কথা কহিয়া তোমাকে একটীমাত্র দুর্ব্বাক্য না বলিয়া সেই যাতনা দিয়াছি। তুমি অন্তর্দর্শিণী। আমার হৃদয়ে বুঝিতে পারিয়াছি, তাই বুঝি অমল অন্তরের অম্লান প্রণয়ে অসহ্য আঘাত লাগিয়াছে; তাই বুঝি তোমার অন্তর দুর্ব্বিসহ যাতনায় অভিভূত—যে যাতনা শত ভ্রাতৃজায়া দিতে অক্ষম; তাই বুঝি তোমার বহুদিন সঞ্চিত আবেগ স্রোত আজ অশ্রুরূপে বিগলিত।"

লোকটা ক্রমাগত আতুরের মত কথা কহিতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম "মহাশয়! স্থির হউন একটু বিশ্রাম করুন।" কিন্তু লোকটী থামিল না। সে আবার বলিতে লাগিল।

"সুখের রজনী—সুখের কেন? সুখদুঃখের রজনী অতিবাহিত হইল। সে রজনী বড় সুখের। বিনিদ্র রজনী বড় সুখে গত দুঃখের চিন্তা করিতে করিতে অতিবাহিত হইল। সুখ রজনী চিরতরে অতিবাহিত হইল প্রভাতে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলাম। বাহিরে একটা কাজ ছিল—একটী সর্ব্বনাশী মর্ম্মদাহী কাজ।

ফিরিতে রাত্রি হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর, আশ্রয় নাই সুতরাং সেই রাত্রে বাটীতেই ফিরিতে হইল। তাড়াতাড়ি বাটীতে ফিরিতে লাগিলাম। আকুল অন্তরে অম্লান কৌমুদীধৌত পথ গুলি তাড়াতাড়ি অতিক্রম করিয়া যেন একটা দুর্ব্বিসহ উৎকণ্ঠা হৃদয়ে ধরিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিতে লাগিলাম। নীরব রজনী জ্যোস্নাধৌত—মাঝে মাঝে একটী পেঁচক উড়িয়া যাইতেছে বৃক্ষপত্র মন্দ-বাতাসে মর্ম্মরিত—যেন একটা রাজত্ব নীরবে চলিতেছে—মানুষ যেন সে রাজ-ত্বের লোক নহে। তাড়াতাড়ি নীরবে গৃহে প্রবেশ করিলাম। কাহারও সাড়াশব্দ নাই—অথচ কেহ নিদ্রিত নহে—যেন একটা কি নূতন আশ্চর্য্য

ঘটনা ঘটিয়াছে। বাটীতে প্রবেশ করিতেই একজন ঝি কাঁদিয়া কহিল ছোট দিদির বিসূচিকা হইয়াছে। স্তম্ভিত হইলাম। স্তম্ভিত অন্তঃকরণে গৃহে প্রবেশ করিলাম—দেখিলাম লক্ষ্মী পড়িয়া আছে, বিসূচিকা রোগে আক্রান্তা নহে—মৃত। তখন কি করিয়াছিলাম জানি না। হয়ত সংজ্ঞা-লোপ হইয়াছিল। মহাশয়! তারপর আমার এই দশা। কিছুকাল আমি সংজ্ঞাহীন ছিলাম। তারপরে একবার শেষ দৃষ্টি তাহার উপরে নিপতিত হইল; দেখিলাম—ক্ষীণা শয্যাশ্রিতশরীরা দীপ্তিবিহীনা লক্ষ্মী পার্থিব দুঃখসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ভ্রাতৃজায়ার অপরিসীম দুর্ব্ব্যবহার, আমার মর্ম্মঘাতী অত্যাচার হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছে; দেখিলাম জালমার্গনির্গত জ্যোস্না তাহার ম্লান মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়াছে—আহা! সে সুন্দর পবিত্র মুখমণ্ডল মরজগতের নহে; তাই বুঝি অমরজগতের একটী বাতাস ধীরে ধীরে তাহা অপহরণ করিতেছে—সেইদিন বুঝিলাম আমার হৃদয় শূন্য; সেইদিন বুঝিলাম জগতে যদি পবিত্র প্রণয়ের অস্তিত্ব থাকে তাহা আমি লাভ করিয়াছি ও নিজদোষে বিসর্জ্জন দিয়াছি, মহাশয়! জ্ঞানে যখন কোন ফল হয় না তখন জ্ঞানের উন্মেষ হয় কেন? লক্ষ্মীর মনোভাব আমি জানিতে পারি নাই—যদি জানিতাম, সে মরিল কেন? যদি সে মরিবে সে জ্ঞানের উন্মেষ হইল কেন? চিরবিচ্ছেদ না ঘটিলে কি প্রণয়ের গুরুত্ব জানা যায় না। যাহাকে আমি দেখিতে পারিতাম না তাহার মৃতদেহ দেখিতে এত সাধ যায় কেন? যাহার মুখমণ্ডলে মধ্যাহ্নজ্যোতিঃ ভাল লাগিত না সেই মুখমণ্ডলের দিগন্ত-বিলীন অরুনিমা এত ভাল লাগে কেন?

দেখিলাম লোকটা ভয়ানক মুখভঙ্গি করিতেছে। বুঝিলাম সে আর প্রকৃতিস্থ নহে।

লোকটী কহিল "মহাশয়! আর বিরক্ত করিব না আমি আসি।"

লোকটী চলিয়া গেল। আমারও কেমন সমস্ত মনটা খারাপ হইয়া রহিল।

দুর্গেশনন্দিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৯৭ সপ্তনবত্যধিকনবশততমবঙ্গাব্দীয় নিদাঘশেষে একস্মিন্নহনি কেনচিদ্-আরোহিণা বিষ্ণুপুরতো মান্দারণপথেন একাকিনা চলতা দিনকরমস্তাচল-গমনে ত্বরমানমালোক্য চপলবেগেন চালিতস্তুরগঃ। যতো নিকষা প্রবীণ-প্রান্তরং; জানামি কিং, কালধর্ম্মেণ চেৎ প্রদোষকালে প্রবলঝটিকাবৃষ্টি প্রবর্ত্তিষ্যেতে, তয়া যৎপরং নাস্তি পীড়িতো ভবেয়ম্ আশ্রয় বিহীনে, প্রান্তরে তস্মিন্।

প্রান্তরমনুত্তীর্ণ এব তাবদস্তমিতো দিনমণিঃ; ক্রমশো নৈশগগনং নীল-নীরদমালয়া সমাবরিতুমারব্ধং। সায়মেব এবম্বিধ মতিঘোরমন্ধকারং দিগন্তেষ্বসংস্থিতং যৎ, অশ্বচালনমতীবকঠিন মবোধি। পান্থস্ত কেবলং বিদ্যুৎ-প্রভাপ্রদর্শিতেন পথা কথমপি চলিতুমারভত। কিয়ৎকালেন নিদাঘঝটিকা মহারবমধাবত, এবঞ্চ সহ সহ পতিতু মারভত বৃষ্টিনাং বলবতীধারা, অশ্বারোহী গন্তব্যপথস্য নপুনঃ কিঞ্চিন্মাত্রেস্থিরতা মাপ। শিথিলীকৃত—রশ্মিরশ্বো যথেচ্ছ মারভতগন্তুং। কিয়দ্দূরমনেন চলতস্তুরগস্য চরণৌ কস্যচিৎ কঠিনবস্তুন আঘাতেন সহসা স্খলিতৌ পথিকস্তদা সকৃদ্ বিদ্যুৎপ্রকাশেন পুরতো-ধবলাকারং কিমপি প্রবীণং বস্তু চকিতমাত্র মালোকয়ৎ। ধবলাকার-স্তূপোঽসৌ ভবেদট্টালিকা, ইতি বিবিচ্য তুরগারোহিণা প্রলম্ব্য ভূতলে-ঽবতীর্ণং। অবতরণমাত্রমবগতং যৎ, উপলরচিত সোপাবলীনামাঘাতেন তুরগচরণৌ স্খলিতৌ।

অতত্রবারাৎ আশ্রমোঽস্তীতি জানতা পরিহৃতস্তুরগঃ। স্বয় মন্ধকারে সাবধান মারভত চরণবিন্যাসং সোপানপথে। তড়িতালোকৈ ত্বরিতমবগতো যৎ, পুরোবর্ত্তিন্যট্টালিকা দেবমন্দিরমেকং। কৌশলতস্তস্য ক্ষুদ্রদ্বার মুপেত্য দৃষ্টং যৎ, দ্বারং পিহিতমস্তি; করঘনেনাবগতং, বহির্দ্দেশতো নচ পিহিতং। ইতো জনহীনে প্রান্তরবর্ত্তিনি মন্দিরে কেন তাবদগুরতো রুদ্ধমর্গল মেবম্বিধে কালে, ইতি চিন্তয়ন্ পথিকোঽসৌ কিঞ্চিদ্বিস্মিত স্তথা কৌতূহলাবিষ্টো বভূব। আরভেচ শিরসি প্রবলবেগৈ ধারাপাতো ভবিতুং, সুতরামস্ত যঃকশ্চিদ্দেবালয়-

মধ্যবাসী, পথিকস্তু দ্বারিভূয়োভূয়ো বলদর্পিতকরাঘাতমারভত কর্ত্তুম্, দ্বার-বিমুক্তয়ে ন কোঽপি সমায়াতঃ। ইচ্ছা, পদাঘাতেন কপাটমোচনে, কিন্তু দেবালয়স্য পশ্চাদবমাননা ভবেদিতি শঙ্কমানপথিকেন ন তাবদনুষ্ঠিতং। তথাপি তেন কপাটোরনি বিধীয়মানদারুণকরাঘাতং কাষ্ঠময়কপাটো ন চিরমসহত, অচিরমেব চ্যুতার্গলো জাতঃ।

দ্বারি মুক্তায়ামেব যুবা যাবন্মন্দিরমধ্যে প্রবিশতি তাবদেব তস্মিন্ অস্ফুট-চীৎকাররবস্তস্য কর্ণাকাশমবিশৎ, তন্মুহূর্ত্তে মুক্তদ্বার পথের্ঝটিকাবেগবহনা স্তত্রত্যজ্বলৎ—ক্ষীণ প্রদীপো নির্ব্বাণঃ। মন্দিরমধ্যে কোবা মনুজ স্তিষ্ঠতি দেবোঽপিবা কিমাকারঃ, প্রবেশকস্তৎ কিমপি নালোকয়ৎ।

স্বকীয়া-বস্থাম্ এতাবতীমালোক্য নির্ভীকো যুবা কেবলমীষদ্বিহস্য, স মুহুরাগ-মাদৌ মন্দিরবর্ত্তিনীং অদৃশ্যদেব—মূর্ত্তিমনসৎ। অনন্তরমুখায় তমসি সমাহূয় কথিতবান্—

"মন্দিরমধ্যে কঃস্তিষ্ঠসি?" কেনাপি ন বিহিতমুত্তরং প্রশ্নস্য, কিন্তু কর্ণে ভূষণশিঞ্জিতমবশিৎ।

* * * * *

পথিকস্তদা বৃথাবচোব্যয়েনালমিতি বিবিচ্য ঝটিকাধারাণাং অবরোধায় দ্বারমযোজয়ৎ। অপিচ ভগ্নার্গলবিনিময়েন দ্বারি নিজবপু র্নিধায় পুনরাহ, "যঃ কশ্চিন্মন্দিরমধিতিষ্ঠসি, আকর্ণয়ং অয়মস্মি শস্ত্রপাণির্দ্বারদেশে নিষন্নঃ, মাকুরুমে বিশ্রামবিঘ্নং। বিহিতে বিঘ্নে পুরুষশ্চেৎ ফলমাপ্স্যসি যদি পুমঃ স্ত্রীজনোঽসি নিশ্চিন্তো নিদ্রাহি, অতিচর্ম্মণি রাজপুতকরে বিরাজমানে চরণেষু নোবঃ কুশাঙ্কুরোঽপি প্রবেক্ষ্যতি।" "কো ভবান্?" মন্দিরতো দ্বাস্থাস্বরেণ প্রশ্নোঽয়মুপস্থাতঃ। শ্রুত্বাচ পথিকেন সবিস্ময় মীরিতম্

"স্বরেণাবগচ্ছামি কয়াচিদবলয়া বিহিতোঽয়ং প্রশ্ন।"

"মৎপরিচয়েন কিমুপজায়েত ভবত্যাঃ?" মন্দিরতো জাতমুত্তরম্, "আবা-মতীবভয়াকুলেজাতে" যুবকেনাভিহিতং, যত্রবাঽমস্মি স্বমাত্মপরিচয়দানে নাস্তি রীতিরস্মাকং। কিন্তু ময়ি বর্ত্তমানে নূনমবলাজাতের্নাস্তি কাপি বিঘ্নাশঙ্কা।

রমণী চাহ, "ভবতো বচো নিশম্য সাহসমুৎপন্নং যে, ইয়ৎকাল মাবাং ভয়েন মৃতবদবস্থিতে। অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা তাবদধুনাপি মে সহচরী। সামাবাং ইয়ং শৈলশ্বশিবমর্চ্চয়িতুমাগতে। ততো ঝটিকায়াং আগতায়াম্ আবয়ো র্বাহকদাসদাসীমিত্রা আবামপহায় কুতঃ প্রস্থিতবন্তো ন কথয়িতমলম্।"

যুবকেনাভিহিতং মা চিন্তয়তু বিশ্রাম্যতাং ভবত্যৌ, কল্যপ্রাতরহং গেহমাপয়িষ্যে ভবত্যৌ।"

রমণীচাহ "শৈলেশ্বরো মঙ্গলমনুতিষ্ঠতু ভবতঃ।"

নিশীথে বিরতিমাপন্নাসু বৃষ্টিঝটিকাসু, যুবাহ, কিয়ৎকালং কথমপি সাহসমালম্ব্য স্থীয়তামত্র। অহমেকং দীপমাহর্ত্তুং সমীপবর্ত্তিনিগ্রামে যামি।"

ইতি নিশম্য ভাষমানা হ, মহাশয়! গ্রামং যাবৎ গমনেনালম্। এতন্মন্দিররক্ষিতা কশ্চিৎ কিঙ্করস্তাবৎ আবাদেব নিবসতি, জ্যোস্না প্রকাশিতা, মন্দিরবহিরালোকয়িষ্যতি তস্য কুটীরং। একাকী স প্রস্তরমধ্যে বসতীতি সততমাবাসে বহ্নিদীপনমবর্ত্তি।" এতৎকথামনুসরন্ যুবকো মন্দিরবহিরেত্য জ্যোস্নালোকৈর্দ্দেবালয়রক্ষিতুং গেহমালোকয়ৎ। গেহদ্বারমিতশ্চ তস্য শয়নমপনিনায় মন্দিরপালো ভিয়া দ্বারমবিমোচ্য কোঽয়মায়াতীতি পূর্ব্বম্ অন্তরালাদারভত দ্রষ্টুং। সবিশেষ মীক্ষামাণপথিকস্য ন কিমপি দস্যুচিহ্নমালোকিতবান্; বিশেষতস্তদঙ্গীকৃতস্বর্ণমুদ্রালোভসম্বরণং অনেন দুষ্কর মুপজাতম্। ইতস্ততো বিচিন্ত্য মন্দিরপালো দ্বারং বিমোচ্য, প্রজ্বালাদীপং অর্পিতবান্। দীপমানীয় পথিনালোকি, মন্দিরমধ্যে ধবলোপলচিতা নিহিতা শিবমূর্ত্তিরস্তি। তন্মূর্ত্তেরনুপদং কেবল মবলাযুগলং। যা নবীনা সাতু দীপালোকনাদেবা সাবগুণ্ঠনং নতমুখমাস্ত। পরন্তু তস্যা অনাবৃতপ্রকোষ্ঠে হীরকমণিভূষিতবলয়ম্ অঙ্গেচ বিবিধকারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদঃ, তদুপরি রত্নাভরণনৈপুণমালোক্য পথিকেন নির্বিকল্পমবগতং যৎ, নবীনেয়ং নীচকুলসম্ভূতা নহি।

দ্বিতীয়রমণীপরিচ্ছদস্য ততো লঘুমূল্যতয়া পথিকেনাবধারিতং যৎ, এষা নবীনাসহচরী দাসী নাম, অথচ প্রাকৃতদাসীমপেক্ষ্য সম্পন্না। বয়স্তস্যাঃ পঞ্চত্রিংশদ্বর্ষ মবধারিতং। আয়াসমন্তরেণৈব প্রতীতি রুপজাতা যুবপুরুষস্য যৎ, বয়োঽধিকয়ৈব সাকমালাপিতং তেন। সবিস্ময়মিদমপি তেনালোকি যৎ, তদুভয়োর্মধ্যে নচ কস্যাশ্চিদপি পরিচ্ছদ এতদ্দেশীয়স্ত্রীজনানুরূপঃ, উভএব পাশ্চাত্যদেশীয়ে, অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকবেশভূষিতে।

যুবকস্তু মন্দিরমধ্যে যথোচিতস্থানে প্রদীপং নিধায় রমণীযুগলপুরতো বভূব দণ্ডায়মানঃ। তদা তচ্ছরীরোপরি পতিতে দীপরশ্মিনিচয়ে, রমণীযুগলেনালোকি যৎ, পথিকবয়ঃ পঞ্চত্রিংশদ্বর্ষতঃ কিয়দধিকং নামং শরীরম্ এবম্বিধ মায়তং যৎ, অপরন্তু তাদৃশমসৌষ্ঠবকারণমভবিষ্যৎ। কিন্তু যুনো বক্ষোবিশাল-

তয়া সকলাবয়বানাং প্রচুরায়তনগঠনেন চ দীর্ঘতাসৌ নূন মলৌকিকসৌন্দর্য্য-হেতুঃ রূপজ্জাতঃ। বর্ষাসম্ভূতনবদূর্ব্বাদলরূপা, অথবা তদধিকমনোহরা শরীরকান্তিঃ, বসন্তপ্রসূত-নবপলাশসমবর্ণোপরি কবচাদয়ো রাজপুতজাতে ভূষণশোভা বিহিতবন্তঃ।

কটিদেশস্থে কটিবন্ধে কোষনিহিতস্তরবারিঃ, দীর্ঘকরে দীর্ঘং বর্ষ্মশং, মস্তকে শিরস্ত্রাণম্, ওষ্ঠ্রেকো হীরকখণ্ডঃ কর্ণে মুক্তাসহিতকুণ্ডলম্; কণ্ঠে রত্নহারঃ।

পরস্পরদর্শনেন উভয়পক্ষাবেব পরস্পরপরিচিতয়ে সাতিশয়াকুলৌ জাতৌ, কিন্তু কোঽপি পরিচয় পৃচ্ছয়া পূর্ব্বং অসাধুতামনুষ্ঠাতুং নাভিলাষুরভবৎ।

ক্রমশঃ।

শ্রীবসন্তকুমার কাব্যতীর্থ।
সিদ্ধকাঠী স্কুল।

পোষাপাখী।

১

আদরে একটী নব পাখী
পুষিলাম হৃদিমাঝে রাখি,
এই আশে স্বরে সুধামাখি,
সদা সে করিবে ডাকা ডাকি,
তাতেই মোর দগধ হৃদয়
হইবে শীতল;
সে আশা দুরাশা হ'ল, দিয়ে মোরে ফাঁকি,
অই গেল—উড়ে গেল, মোর পোষাপাখী!

২

পাখিটীরে কতই আদরে,
পুষেছিনু দুধ, ছানা, সরে,
রেখেছিনু বুকের ভিতরে,
এই আশে—লহরে লহরে

ভুলিয়া সে মধুময় তান
মোহিবে জগত ;
সে ত বুঝিলনা মোর এত উচ্চ আশা,
অই গেল—উড়ে গেল, ছেড়ে ভালবাসা।

৩

আমিত বেসেছি ভাল তারে,
প্রতিদানে সে কি গো আমারে
ফেলে দিয়ে দুস্তর সাগরে
উড়ে গেল বনের ভিতরে ?
এইবার বুঝিয়াছি বেশ !
এ পোড়া জগতে
করিলে কাহারো ভাল তারি প্রতিদানে,
সময় পাইলে সেত বধে গো পরাণে!

৪

যেদিন বনের পাখিটীরে,
পুরিলাম লোহার পিঞ্জরে,
সে দিন ত মনের ভিতরে
পাখিটী উড়িয়া বনান্তরে
যাইবে সময় পেলে হায়!
এই কথা তবু
উঠেনি ; তাহারি ফল ভুগিয়ে এখন,
পাখি হারা হয়ে দুখে কাঁদে প্রাণ মন।

৫

হায়, পাখি ! স্নেহের বাঁধন,
অসময়ে কেনরে ছেদন
করিলি, কাঁদালি প্রাণ, মন,
অভাগায় ! এবে অনুক্ষণ
তোর তরে করে হায় ! হায় !
একবার চাহিয়া,

ন. না—তুইত নিঠুর বড় বুঝেছি এখন,
এযে সুধু অভাগার "অরণ্যে রোদন !"

শ্রীমহম্মদ খোজামোলহক্
ভোলা।

প্রভাতে।

১। রাতি পোহাইল
প্রভাত হইল
ফুটিল কুসুমচয়।
পূরব আকাশে
মৃদু হয় আশে
সুরম উদিত হয়।

২। শয্যা পরিহরি
উঠি দেয় নারী
গাহিছে বিভুর নাম।
তরুপরে পাখি
কুজনিত মাখি
ধরিছে মধুর তান।

৩। সরলা বালিকা
কুসুম কলিকা
চয়নে হইল রত।
গৃহস্থের নারী
মনমত করি
সাধিছে আপন ব্রত।

৪। যতেক রাখাল
লইয়া গোপাল
গোচারণে গোঠে যায়।

কৃষকের দল
লইয়া লাঙ্গল
মাঠ পানে দ্রুত ধায়।

৫। বালক সকলে
বসি কুতূহলে
পড়িছে আপন পাঠ।
রমনীমণ্ডলে
মিলি দলে দলে
চলেছে জলেরি ঘাট।

৬। প্রাচীনা যাহারা
এক মনে তারা
পুজিতেছে ইষ্ট দেবে।
নবীনা যুবতী
যত রসবতী
চলিয়া পড়িছে ভাবে।

৭। সুন্দর প্রভাতে
কেবল জগতে
অসুখী অভাগা যত।
নিরজনে বসি
চালে অশ্রুরাশি
নিশি দিন ধরি এত।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
নির্জাপুর।